গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২ জুলাই, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ব্লক স্তরে সালিশি বোর্ড

সিপিএম এত তৎপর কেন ?

সিপিএম ফ্রন্ট সরকার প্রস্তাবিত ''পশ্চিমবঙ্গ ব্লক পর্যায় সালিশি বোর্ড-২০০৩'' বিল নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রবল বিতর্ক এবং প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছেন — ''সিপিএম পঞ্চায়েতের সালিশির নামে বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দলীয় শক্তিবৃদ্ধি করছে, সন্ত্রাস বাড়িয়ে চলেছে। সালিশি বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা সেই প্রক্রিয়ারই সম্প্রসারণ।''

বিলে বলা হয়েছে — ব্লক স্তরে এই সালিশি বোর্ডের কনসিলিয়েটর (সালিশ), লিগ্যাল অ্যাডভাইসর (আইনি পরামর্শদাতা) ও কাউন্সেলরদের (পরামর্শদাতা) নিযুক্ত করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি যে প্যানেল তৈরি করবে সেই প্যানেল থেকেই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সালিশি বোর্ডের সদস্যদের নিযুক্ত করবে। এই সালিশদের সাম্মানিক সহ বোর্ডের সমস্ত খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। বোর্ডের সকলের কার্যকালের মেয়াদ হবে দু'বছর। অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ এবং সালিশিযোগ্য (কম্পাউন্ডেবল) ফৌজদারি কিছু বিবাদ এই বোর্ডের এক্তিয়ারে রাখা হয়েছে।

রাজ্য সরকার বলছে — এদেশে গরিব মানুষ বিচার পায় না। কারণ, প্রথমত আদালতের খরচ গরিব মানুষের সামনে বাধা। দ্বিতীয়ত, আদালতে লক্ষ লক্ষ বকেয়া মামলার পাহাড় জমে আছে। রাজ্যের আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী লিখেছেন — ''বর্তমানে শুধু পশ্চিমবঙ্গে জমে থাকা মামলার পরিমাণ ১৫ লক্ষের বেশি।...আমাদের দেশে ০.১ শতাংশ মানুষও তাঁদের বিরোধ বা ক্ষোভকে আদালতের মাধ্যমে মেটাতে পারেন না। নগরকেন্দ্রিক জটিল পদ্ধতির ব্যয়বহুল বিচারব্যবস্থাকে গ্রামের গরিব মানুষেরা বিরোধ মীমাংসার মাধ্যম হিসাবে কদাচ গ্রহণ করেন'' (গণশক্তি ২২-৬-০৪)। তৃতীয়ত, রাজ্য সরকার বলছে, আদালতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করাই লক্ষ্য — এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ জুন ২০০৪ এক বিবৃতিতে বলেন —

''পুলিশের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন এবং নানাভাবে বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে না পেরে সিপিএম সম্পূর্ণ হীন দলীয় স্বার্থে এখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পার্টির ভোট ব্যাঙ্ক গড়া ও মজবুত করা এবং সর্বোপরি বিরোধী শক্তিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে সালিশি বোর্ড গঠনের আইন করতে চলেছে। এমনিতেই দীর্ঘদিন যাবত গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন বিবাদ উস্কে ও বাড়িয়ে দিয়ে এবং মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে দিয়ে সিপিএম পঞ্চায়েতের সালিশির নামে বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দলীয় শক্তিবৃদ্ধি ও সন্ত্রাস বাড়িয়ে চলেছে। সালিশি বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা সেই প্রক্রিয়ারই সম্প্রসারণ।

এই ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্যই বর্তমানে এটাকে তারা আইনসিদ্ধ করতে চাইছে। আমরা এই কালা বিল প্রত্যাহার দাবি করছি এবং আইনজীবীদের প্রস্তাবিত আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছি।''

ভাড়াবৃদ্ধির অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই আন্দোলনে নামছে

২৫ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

আমরা মনে করি, রাজ্য সরকার পরিবহনের যে ভাড়া বাড়াতে চলেছে, তা সম্পূর্ণ যাত্রী- স্বার্থবিরোধী। তেলের দাম যা বেড়েছে তাতে ভাড়া বাড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। এর ফলে পরিবহন মালিকদের লাভ হয়তো কিছুটা কমতে পারে, কিন্তু লোকসানের কোন প্রশ্ন নেই। আমরা বারবার চেয়েছি, বাস মালিকদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরপেক্ষ কমিটিকে দিয়ে তদন্ত করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। সরকার তা করেনি। বাঙ্গালোর, চেন্নাই, ত্রিবান্দ্রম, হায়দ্রাবাদ, আমেদাবাদ, গুয়াহাটি সহ দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে এখনও বাসের ন্যূনতম ভাড়া ২ টাকা। তেলের দাম সর্বত্র বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভাড়া বাড়ানোর উদ্যোগ কোথাও নেওয়া হয়নি। ইতিপূর্বে ভাড়া বাড়ানোর সময়ে পরিবহন মন্ত্রী বলেছিলেন, ভাড়া এমন করে বাড়ানো হচ্ছে যাতে তেলের দাম বাড়লেও বারবার যাত্রীভাড়া বাড়াতে না হয়, বলেছিলেন, বর্ধিত ভাড়ার বেশিরভাগ অংশ যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করা হবে। বাস্তবে এ রাজ্যে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু নেই। আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকার তেলের উপর আমদানি শুল্ক, উৎপাদন শুল্ক বিপুল পরিমাণে চাপানোর ফলেই আন্তর্জাতিক বাজারের থেকেও বেশি হারে এদেশে তেলের দাম বাড়ছে। বর্তমানে সিপিএমের সমর্থনেই কেন্দ্রীয় সরকার চলছে। এই দামবৃদ্ধির সিদ্ধান্তও সিপিএমের সমর্থনেই নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারও বিক্রয়কর ও সেস্ বসিয়ে তেলের দাম আরও বাড়াচ্ছে।

আমরা এই ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনে নামছি, সর্বত্র যাত্রীকমিটি গড়ে তুলছি। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করছি। যাত্রী সাধারণকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার ও বাড়তি ভাড়া বয়কট করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।''

আরও খবর আটের পাতায়

গুজরাটে ছাত্রীহত্যা ঃ বহু প্রশ্নেরই উত্তর নেই

আবারও গুজরাটে মোদী সরকারের পুলিশ 'জঙ্গি' সন্দেহে ১৭ বছরের এক ছাত্রীসহ চারজনকে খুন করল। তারা নাকি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করতে এসেছিল, যদিও এখনো পর্যন্ত সেই সন্দেহের পক্ষে কোন প্রমাণই তারা যোগাড় করতে পারেনি। পুলিশের অভিযোগ, জঙ্গিদের গাড়িতে একাধিক এ কে -৫৬ রাইফেল ও ২০ কেজি বিস্ফোরক পাওয়া গেছে। জঙ্গিরাই নাকি গাড়ি থেকে পুলিশের দিকে আগে গুলি ছুঁড়েছে এবং তার পরিমাণ ৩৫ রাউন্ড। অথচ কোন পুলিশের গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি। পুলিশের গুলিতে গাড়িতেই চার জঙ্গির মৃত্যু হলেও, তাদের ২০ কেজি বিস্ফোরক অটুট রয়েছে। ধন্যি গুজরাট পুলিশের ট্রেনিং, ধন্যি তাদের দক্ষতা! অবশ্য এই অভূতপূর্ব দক্ষতা তারা এর আগেও তিনবার দেখিয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জঙ্গিরা নাকি আগে গুলি চালিয়েছে, তৎসত্ত্বেও পুলিশ অক্ষত থেকেছে, আর মারা গিয়েছে জঙ্গিরা।

এবারের ঘটনাটি এমন একটা সময়ে ঘটল, যখন মোদীর গদি টলমল, দলে তিনি কোণঠাসা, লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ হিসাবে মোদীর নেতৃত্বে গুজরাটে নির্বিচারে সংখ্যালঘু নিধনকেই দায়ী করা হচ্ছে। ফলে জনমনে আজ এ প্রশ্ন প্রবলভাবে আন্দোলিত যে, হিন্দুত্ববিরোধীরা তাঁকে খুন করতে চায় — এই ধারণা সৃষ্টি করে এ বিপদের সময়ে তাঁর পিছনে হিন্দুত্ববাদীদের সমবেত করাই এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য নয় তো ! হিন্দুত্বের জিগির প্রবল থাকায় পূর্বেকার ঘটনাগুলিতে সন্দেহকারীদের প্রশ্নগুলি সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু এবার সে জিগির কিছুটা স্তিমিত থাকায় নানান প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসছে। ২০০১ সাল থেকে গুজরাট পুলিশের সাথে অন্তত ছ'টি এ ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং তাতে দশ জন 'জঙ্গি' মারা গেছে। এর মধ্যে তিনটি ঘটনায় অনুরূপ মোদী হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই ধরনের প্রতিটি সংঘর্ষই এমন সময়ে ঘটছে, যখন মোদী রাজনৈতিকভাবে কিছুটা সঙ্কটে; প্রতিটি সংঘর্ষই হয়েছে নির্জন স্থানে, গভীর রাতে এবং কোনটিতেই পুলিশ ছাড়া কোন সাক্ষী নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'জঙ্গিরা' আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পুলিশকে আগে আক্রমণ করলেও পুলিশের কোন ক্ষতি হয়নি; কোন ক্ষেত্রেই কোন জঙ্গি সংগঠনই এই সংঘর্ষের দায়িত্ব স্বীকার করেনি; কোন ক্ষেত্রেই এই সংঘর্ষের যথাযথ অনুসন্ধানও হয়নি। এ প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর একমাত্র নিরপেক্ষ তদন্ত দ্বারাই পাওয়া যেতে পারে। আর নিরপেক্ষ তদন্ত যে গুজরাট পুলিশের দ্বারা সম্ভব নয়, তা নিয়ে আজ বোধহয় কোন বিবেচক মানুষেরই সংশয়

পাঁচের পাতায় দেখুন

বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঃ পুরুলিয়ায় বিক্ষোভ

পুরুলিয়া জেলার স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল অবস্থার প্রতিকারের দাবিতে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'র উদ্যোগে ৭ জুন বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং জেলার সদর হাসপাতালের সি এম ও এইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সি এম ও এইচ-এর সাথে আলোচনার শেষে প্রতিনিধি দলের একজন মুখপাত্র জানান যে, তাঁরা সারা জেলায় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, জেলার ৭০/৭২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেশিরভাগ প্রায় পরিত্যক্ত এবং সেগুলিতে কোথাও সমাজবিরোধীরা আস্তানা গেড়েছে, কোথাও পশুর খোঁয়াড় হয়েছে, আবার কোথাও পুলিশ প্রশাসনের ক্যাম্প চলছে। জেলার গুটিকয়েক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে উন্নত করার নামে বর্তমানে জেলার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা যতটুকু ছিল তাও ধ্বংস করা হচ্ছে। পুরুলিয়া শহরের সদর হাসপাতালটিতেই নেই প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী ; বেশিরভাগ ওষুধই বাইরে থেকে কিনতে হয়। নেই রোগীর আত্মীয় স্বজনের বিশ্রাম নেওয়ার মতো জায়গা এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা। রঘুনাথপুরের স্টেট জেনারেল হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই। আলট্রা সোনোগ্রাফির মেশিন থাকা সত্ত্বেও রোগীরা কোন পরিষেবা পান না। সপ্তাহে মাত্র একদিন সিজারিয়ান অপারেশন হয়। রঘুনাথপুরের পুরনো হাসপাতালটি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। চয়নপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজা, জানালা, ইঁট চুরি হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বসেছে। অথচ ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল থেকে মাত্র ১০ কিমি দূরে। সেখানে যাতায়াতের জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রোগীদের কোনো পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ছড়া থানার খৈরী-পিহীড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে ছিল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং শয্যার ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমানে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি প্রায় উঠে যেতে বসেছে। ঐ থানারই চাটুমাদার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতেও নেই কোন এম বি বি এস ডাক্তার। ঝালদা থানার মাহাতমারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে পুলিশ ক্যাম্প হওয়ার ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় উঠে যাওয়ার মতো। বাঘমুণ্ডীর কড়েং বা পুঞ্চার বাগদায় নেই প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স এবং ওষুধপত্র। মানবাজার থানার পায়রাচালি স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নিয়ে প্রশাসনিক মহলে চলছে ডাক্তার, নার্স কমিয়ে সংক্ষিপ্ত চিকিৎসার পরিকল্পনা। কমিটির নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, অবিলম্বে পুরুলিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অনাদিচরণ লায়েক, অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, প্রণতি ভট্টাচার্য, সাধন দাস, প্রবীর মাহাতো, সুনীতি ভট্টাচার্য এবং কালী কিৎ।

ডি ওয়াই ও উল্টাডাঙ্গা সম্মেলন

মদের ঢালাও লাইসেন্স, সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত প্রচারমাধ্যমে অশ্লীলতার প্রচারের প্রতিবাদে, স্বনিযুক্তির ভাঁওতার পরিবর্তে সমস্ত কর্মক্ষম যুবকের কাজ ও যুবজীবনের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে যুব আন্দোলন ও সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গত ২০ জুন কলকাতা জেলার উল্টাডাঙ্গায় ডি ওয়াই ও'র আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে।

৫২ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনে সর্বসম্মতিতে কমরেড অমর শাসমলকে সম্পাদক করে ১৩ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সবশেষে ডি ওয়াই ও'র লক্ষ্য ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন কমরেড নিরঞ্জন নস্কর ও সুরথ সরকার।

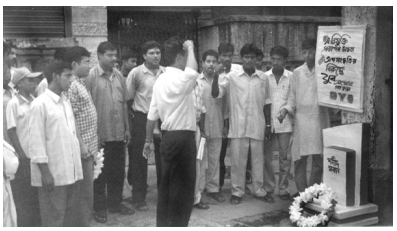

পেট্রোপণ্যের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ

গত ১৬ ও ১৭ জুন বাঁকুড়া শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকারের জনস্বার্থবিরোধী পেট্রল, ডিজেল, জ্বালানী গ্যাস ও কয়লার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে পথসভা সংগঠিত করা হয়। দু'দিন ধরে স্কোয়াড মিছিল ও পথসভাগুলিতে শহরের বহু মানুষ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বক্তব্য শোনেন।

১৬ জুন লালবাজার, রাণীগঞ্জমোড়, চকবাজার, ও মাচানতলা মোড়ে এবং ১৭ জুন বাঁকুড়া গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড, কাঠজুড়িডাঙ্গা মোড়, নুনগোলা মোড়, নূতনগঞ্জ, স্টেশন মোড় ও পাটুপুরে সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস বিদ্যুৎ সীট, স্বপন নাগ, দিলীপ কুণ্ডু, লক্ষ্মী সরকার এবং কৃপাসিন্ধু কর্মকার। প্রতিটি সভাতেই বক্তারা মেদিনীপুরের আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যুরও প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, মেদিনীপুরের মতোই বাঁকুড়ার রাণীবাঁধ, খাতড়া, রাজপুর, সিমলাপাল, সারেঙ্গা, শালতোড়া ইত্যাদি ব্লকগুলোতেও গরিব মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে ডেপুটেশন

মাথাভাঙ্গা হাসপাতালের চরম অব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মাথাভাঙ্গা মহকুমার কেদারহাট, গোপালপুর অঞ্চলে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুরোধে ব্যবস্থা নেওয়া, স্থায়ী এ্যানাসথেটিস্ট ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নার্স নিয়োগ, সুপারের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ বন্ধ, ব্লাডব্যাঙ্ক চালু, চক্ষু অপারেশনের যন্ত্রপাতি আনা ও জীবনদায়ী ঔষধ সরবরাহ করা সহ ১৪ দফা দাবিতে এস ইউ সি আই মাথাভাঙ্গা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২১ জুন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের সুপারের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণ করেন কমরেড প্রদীপ দে, সাগর চৌধুরী, হরিশঙ্কর রায় ডাকুয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রস্তাবিত সালিশি বোর্ড প্রসঙ্গে

একের পাতার পর

মামলার শেষে ''একপক্ষ জেতে, আর একপক্ষ হারে। ফলে বিরোধীপক্ষেরা পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়, সমঝোতার পরিবেশ দূরীভূত হয়।''

সরকার পক্ষের বক্তব্যগুলি দেখলে সাধারণভাবে মনে হতে পারে — ভালই তো! গরিব মানুষ যাতে দ্রুত অল্প খরচে ন্যায়বিচার পায় সেজন্য সরকারের তো অগ্রণী হওয়াই উচিত। কিন্তু একটু গভীরে ঢুকে ভাবলে কতকগুলি প্রশ্ন অনিবার্যভাবে দেখা দেয়।

প্রথমত, এদেশে চার স্তরীয় একটা সাংবিধানিক বিচার কাঠামো রয়েছে, যার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, তার নীচে পর্যায়ক্রমে হাইকোর্ট, জেলা আদালত ও নিম্ন আদালত। এছাড়া গ্রামস্তরে আইনি স্বীকৃতির বাইরে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে সালিশের একটি প্রথা সামাজিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে সুদীর্ঘকাল ধরে চালু রয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এতদিন যাবত এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃত প্রথা হিসাবে যে গ্রামীণ সালিশি প্রথা চলে আসছে, বর্তমানে তার পরিবর্তে সরকারি নিয়মে বোর্ড গঠন করে তাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার হঠাৎ কী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে?

দ্বিতীয়ত, সত্যিই কি রাজ্য সরকার গ্রামীণ গরিব মানুষের কাছে স্বল্প খরচে দ্রুত ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে চায়? তা যদি চাইত তবে তারা আদালতের খরচ কমাচ্ছে না কেন? আর্থিক দিক থেকে দুর্বল মানুষদের আইনি সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকারি খরচে লিগ্যাল এইড সেন্টার চালানো হয়। কিন্তু প্রচারের অভাবে ও গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য গরিব মানুষ কেউই এই সাহায্যের কথা জানে না বললেই চলে। গরিবদের আইনি সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নে আন্তরিক হলে রাজ্য সরকার বহুল প্রচারের মধ্য দিয়ে দেশের সমস্ত গরিব মানুষকে লিগ্যাল এইড সেন্টার সম্পর্কে অবহিত করতে পারত এবং উপযুক্ত কাঠামো তৈরি করে এই প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃতই গরিবের স্বার্থে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারত। তাছাড়া গরিবের মুখ চেয়ে সরকার আদালতের খরচ কমাতে ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থাও নিতে পারত। সরকার সেদিকে কোন পদক্ষেপই নেয়নি শুধু নয়, বরং গত বছর আইনজীবীদের তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে উপেক্ষা করে কোর্ট ফি বিপুল হারে বাড়িয়েছে। এখন তারাই আবার আদালতের ব্যয়বাহুল্যের যুক্তি তুলছে, যার পেছনে সততা থাকতে পারে না।

তৃতীয়ত, আদালতে মামলার পাহাড় জমছে, এটা সত্য কথা। কিন্তু কেন জমছে, সে বিষয়ে আইনমন্ত্রী নীরব। প্রতিবাদী আইনজীবীরা স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, বিচারক সহ অন্যান্য কর্মচারীদের প্রায় ৪০ শতাংশ পদ শূন্য পড়ে আছে। সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক বা কর্মচারী নিয়োগ করছে না। কর্মচারীর অভাবে নিছক সমন জারির মতো সাধারণ কাজ করতেও ছ'মাস লেগে যাচ্ছে। গত বছর কোর্ট ফি বিপুল হারে বাড়াবার সময় রাজ্য সরকার বলেছিল, ফি-বৃদ্ধির ফলে যে বাড়তি আয় হবে তা দিয়ে নতুন আদালত খোলা হবে। কিন্তু বাস্তবে তারা তা করেনি। এই রেকর্ড থেকে এ প্রশ্ন উঠবেই যে, সত্যিই কি গরিব মানুষের কাছে দ্রুত সুলভে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়া সরকারের লক্ষ্য? তা যদি হত তাহলে সর্বাগ্রে তারা আদালতের শূন্যপদে নিয়োগ এবং নিম্নস্তর পর্যন্ত আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করত, কোর্ট ফি কমাতো এবং লিগ্যাল এইড সেন্টারকে আরও কার্যকরী সংস্থায় পরিণত করার চেষ্টা করত। এগুলি করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা পর্যন্ত না করে তারা যে আদালতের নগর কেন্দ্রিকতা ও ব্যয়বাহুল্যকে অজুহাত খাড়া করছে, তার কারণ প্রাতিষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার মধ্যে আজও যতটুকু নিরপেক্ষতা টিকে আছে তা থেকে গ্রামীণ মানুষকে বঞ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য।

সাতের পাতায় দেখুন

মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীর ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে

মেচেদায় এম এস এস-এর পথ অবরোধ

২১ জুন রাতে পূর্বমেদিনীপুর জেলার মেচেদা বাজারে মানসিক ভারসাম্যহীন এক ভবঘুরে তরুণীকে চার যুবক ধর্ষণ করে। বাজারের দোকানদার ও স্থানীয় মানুষ দু'জন ধর্ষণকারী রঞ্জিত দাস ও দিলীপ কয়ালকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অপর দুই ধর্ষণকারী এক মদ ব্যবসায়ী ও এক রেস্টুরেন্টের নৈশ প্রহরীকে পুলিশ এখনো ধরতে পারেনি।

মেচেদা এলাকায় হোটেলগুলিতে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা, মদ জুয়ার প্রসার এবং সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন দিন দিন বেড়ে চলেছে। সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মেচেদা শাখা এসবের প্রতিবাদে অবস্থান, বিক্ষোভ, পথ অবরোধ প্রভৃতি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

২৩ জুন মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েটির ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সহ মেচেদা এলাকায় সমস্ত অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধের দাবিতে এম এস এস-এর আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে কোলাঘাট থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেডস্ অনিতা মাইতি, পুতুল মাইতি, ইলা শী, স্মৃতি পড়িয়া, দেবী পড়িয়া, রমা দাস, প্রতিমা হাজরা প্রমুখ। শেষে ৪১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মহিলারা বিক্ষোভ দেখান।

স্থানীয় দাবিতে ওন্দা বিডিও-র নিকট ডেপুটেশন

গত ১৮ জুন এস ইউ সি আই আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ওন্দা বিডিও-র নিকট স্থানীয় বেশ কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শিশুরাও এই মিছিলে পা মেলায় তাদের মায়েদের সাথে। ওন্দা ব্লকের ৮টি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন এই মিছিলে। তাঁদের দাবি ছিল, ওন্দা-তালডাংরা পিচ রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করা, ওন্দা-চাবড়া পিচ রাস্তা নির্মাণ, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ না করা, এস ই বি ক্যাশ কাউন্টারে শেড নির্মাণ, পুরুলিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেসের ওন্দায় স্টপেজ দেওয়া, রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা, সব গরিব মানুষকে বিপিএল কার্ড দেওয়া এবং পঞ্চায়েতী কর বাতিল করা প্রভৃতি।

নির্বাচন শেষ হতে না হতেই চটশিল্পে নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর মালিকী আক্রমণ

১৫টি বন্ধ চটকলের ৭০ হাজার শ্রমিক আজ কর্মহীন

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের বর্ণময় রোশনাই, প্রতিশ্রুতির অজস্র ফুলঝুরি শেষ হতে না হতেই একের পর এক ১৫টি চটকল বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ৭০ হাজার চটকল শ্রমিকের জীবনে নেমে এসেছে কর্মহীনতার শূন্যতা আর অন্ধকার। বড় বড় হোর্ডিং, কাটআউট, গ্লোসাইন, ট্যাবলো, টাটা সুমো, মোটর বাইকের দাপাদাপি, লক্ষ লক্ষ টাকার প্রচার জৌলুস, বুথ ক্যাম্পের খানাপিনা এবং বিজয় উৎসবের উদ্দাম নাচের হুল্লোড়ে হয়তো কয়েকদিনের জন্য হাওড়া-হুগলি-ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল — কিন্তু নির্বাচনের পরেই একের পর এক লক-আউট এবং সাসপেনশন অব ওয়ার্কের বেআইনি নোটিশ কারখানার গেটগুলিতে ঝুলতে থাকায় শ্রমিকরা আজ আতঙ্কিত। হেস্টিংস, ভিক্টোরিয়া, কানোরিয়া, হাওড়া, হনুমান, সুরা, কামারহাটি, টিটাগড় মাঠকল, এম্পায়ার, মেঘনা, অকল্যান্ড, নিউ সেন্ট্রাল, বালী, বজবজ, ওয়েভারলি এবং সর্বশেষ গ্যাঞ্জেস জুটমিলের লকআউট চরম অন্ধকার নামিয়ে এনেছে চটকল শ্রমিকদের জীবনে। শুধু লকআউট নয়, মালিকরা চরম অন্যায় শর্তাবলী চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, যার মূল কথা হল বেতন কাটা। হাজার হাজার শ্রমিক কোয়ার্টারগুলিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের সরবরাহ। তীব্র গরমের হলকায় এবং পানীয় জলের অভাবে মারা গেল হেস্টিংস জুটমিলের শ্রমিক কোয়ার্টারের একটি শিশু। ঘরের সন্তানকে এভাবে মরতে দেখে শ্রমিকেরা আজ শোকে স্তব্ধ। এক শোকার্ত শ্রমিক চিৎকার করে বলেছিল — 'ওদের আমরা জিতিয়েছি, ওরা এখন কোথায়?' বন্ধ চটকলের শ্রমিকদের জীবনে আজ তীব্র হাহাকার — অনাহারে- অর্ধাহারে শোনা যাচ্ছে মৃত্যু এবং দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। যে নেতা নির্বাচনী বিজয় সমাবেশে সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন — 'এখন পৌরসভা আমাদের, কামারহাটি শিল্পাঞ্চলের এমএলএ আমাদের, এমপি আমাদের, প্রশাসন-রাজ্য সরকার আমাদের, এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের, এখন আমাদেরই রাজ — আমাদের উন্নয়ন আটকায় কে?' সেই নেতা আজ শ্রমিকদের কাছে মুখ লুকোচ্ছেন।

কেন বন্ধ হল এতগুলি চটকল? এ কি রুগ্নতার জন্য মুখ থুবড়ে পড়া? না, তা নয়। বামফ্রন্ট শাসনে নব্বই দশকের শুরু থেকেই চলছে এই 'রোটেশনাল লকআউট' বা পালাক্রমে লকআউটের খেলা। মিল বন্ধ করে অন্যায় শর্ত চাপিয়ে দাও, অনাহারী শ্রমিক আর কতদিন লড়বে। সরকার মালিকের পক্ষে, আইন আদালত সবই মালিকের পক্ষে। কিন্তু এবারের লকআউটে মালিকরা বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের উপর শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে, যে করেই হোক ২০০২-এর শিল্পভিত্তিক কালাচুক্তি চালু করতে হবে। শ্রমিকদের উৎপাদনভিত্তিক বেতন অর্থাৎ বেতনকাটার নীতি, এককথায় 'কাটৌতি' মেনে নিতে হবে। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ৫ জানুয়ারি সিটু- আইএনটিইউসি'র নেতৃত্বে এবং বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে এই 'কালাচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিতে চটকল শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ১৭৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এছাড়া উৎপাদনভিত্তিক বেতন নীতি চালু করে শ্রমিকদের বেতন কাটার কথা বলা হয়। কিন্তু শুরু থেকেই শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ইউটিইউসি-লেনিন সরণী সহ ছ'টি ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে এই কালাচুক্তির বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের প্রতিরোধের সামনে পড়ে আজও পর্যন্ত উৎপাদনভিত্তিক বেতন নীতি চালু করতে পারেনি মালিক-সিটু-আইএনটিইউসি চক্র। গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের নামে সিটু-আইএনটিইউসি নেতৃত্ব চটশিল্পে সাধারণ ধর্মঘট ডাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, ১১ দিন ধর্মঘট চলার পর শ্রমিকদের বকেয়া ডিএ-র (১৩৪ পয়েন্ট) একটি অংশমাত্র শ্রমিকদের দিয়ে দেবার শর্তে চার মাসের মধ্যে এই উৎপাদনভিত্তিক বেতন চালু করার পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং শ্রমিকদের অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত এবং উপেক্ষিত দাবিগুলির মীমাংসা না করেই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। ওই চুক্তিতে শ্রমিকদের প্রাপ্য ফেব্রুয়ারি থেকে বর্ধিত ডি-এ, আগস্ট ২০০৪ থেকে দেওয়া হবে বলে স্থগিত রাখা হয়। এভাবেই মালিকদের সুযোগ করে দেওয়া হয় যেন উৎপাদনভিত্তিক বেতন কাটার নীতি আগস্ট মাসের মধ্যে চালু না হলে মালিকরা আগস্ট থেকে ডিএ না দেবার শর্তটিও তুলতে পারে। বর্তমানে সেই 'ব্লু-প্রিন্ট' অনুযায়ীই মালিকরা একদিকে লকআউট করে শ্রমিকদের উপর যথেচ্ছ চাপ সৃষ্টি করে যে করেই হোক না কেন 'বেতন কাটৌতি' চালু করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে মালিকদের সংগঠন আই জে এম এ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে চিঠি দিয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে মালিকরা আর ভবিষ্যতে বর্ধিত ডিএ দেবে না। ফলে মূল লক্ষ্য হিসাবে মালিকরা বেছে নিয়েছে ২০০২ এর 'কালাচুক্তি' অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন কাটার নীতিটি চালু করা। ২০০২-এর ৫ জানুয়ারির ওই চুক্তিটিই হল আসল 'বিষবৃক্ষ' যার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকার হিসাবে যে মজুরি শ্রমিকরা পেয়ে আসছিল তা কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। ফলে ১৫টি বন্ধ চটকলের শ্রমিকদের 'বেতন কাটৌতি' গেলানোর জন্য মালিকদের এটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত এবং পদক্ষেপ। এবং বলাই বাহুল্য যে, এর পেছনে সিটু-আইএনটিইউসি নেতৃত্বের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে। কারণ ২০০২-এর চুক্তির সময়েই চটশিল্পে সিটু-আইএনটিইউসি সহ পাঁচটি ইউনিয়ন নেতৃত্ব, মালিকদের প্রতিনিধি এবং সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'কোর কমিটি' বা 'নিগোশিয়েটিং কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটি কিন্তু এখন আশ্চর্যজনকভাবে নীরবতা পালন করছে, ১৫টি চটকল তালাবন্দির পরও ওদের কোন হেলদোল নেই। অথচ বলা হয়েছিল, এই কমিটিই শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসা করবে এবং মিল লেভেলে আর কোনও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হবে না। অন্যদিকে তথাকথিত শ্রমিকদরদী বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমদপ্তরও নিষ্ক্রিয় থেকে মালিকদেরই কার্যত সাহায্য করছে।

এখন প্রতিটি চটকলেই কন্ট্র্যাক্ট শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, শ্রমিকদের বেতন কাটা হচ্ছে, রিটায়ার্ড শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি সময় মতো দেওয়া হচ্ছে না। ট্রেনি, লার্নার ইত্যাদি নামে ৩০-৪০ টাকা মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে, কোথাও কোথাও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি না দিয়েই বের করে দেওয়া হচ্ছে। চটকল শ্রমিকদের মূল দাবিগুলি তথাকথিত ইউনিয়ন নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা ও আপসমুখী নীতির ফলে উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। শ্রমিকদের মূল সমস্যা এবং দাবিগুলি হল ঃ

প্রথমত, আগেকার ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ৯০ শতাংশ শ্রমিককে পার্মানেন্ট করা এবং ২০ শতাংশ শ্রমিককে স্পেশাল বদলি হিসাবে রাখা। কিন্তু এই দাবিটি মানা হয়নি। চটশিল্পে বর্তমানে দু'লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি শ্রমিক হল বদলি, কন্ট্রাক্ট, ভাউচার, ট্রেনি, লার্নার ইত্যাদি। এছাড়া রিটায়ার্ড শ্রমিকদের মধ্যেও একটা বড় অংশ গ্র্যাচুইটি না পেয়ে বাধ্য হয়ে কাজ করছে। এই শ্রমিকদের হয় বেতন কমানো হচ্ছে, না হয় গ্র্যাচুইটি না দিয়েই মিল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। এই শ্রমিকদের যেন-তেন প্রকারে বের করে দিয়ে দৈনিক ২০-৩০ টাকায় শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে চটশিল্প থেকে পূর্ণ বেতনের স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, চটশিল্পে আজ দুর্নীতিগ্রস্ত মালিকদের চক্রটি পি এফ, ই এস আই এবং গ্র্যাচুইটির কোটি কোটি টাকা জমা দিচ্ছে না। বর্তমানে চটশিল্পে পি এফ বকেয়ার পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা। ই এস আই বকেয়ার পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা। গ্র্যাচুইটি বকেয়ার পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা।

তৃতীয়ত, মালিকরা গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শ্রমিকদের পাওনা বর্ধিত ডি এ দিচ্ছে না এবং ভবিষ্যতে বর্ধিত ডি এ না দেবার হুমকি দিচ্ছে।

চতুর্থত, চটশিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আজ সিন্থেটিক ব্যাগ। পূর্বতন এনডিএ সরকার বহুদিনের পাটজাত দ্রব্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইনটি শিথিল করে খাদ্যদ্রব্য এবং চিনি প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ সিন্থেটিক ব্যাগের ব্যবহারের আইন করে গেছে। এর ফলে একদিকে আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক এবং ৪০ লক্ষ পাটচাষীর জীবনে নেমে এসেছে চরম অনিশ্চয়তা। যেখানে ইউরোপের দেশগুলি স্বাস্থ্যহানির ফলে সিন্থেটিক ব্যাগ বর্জন করছে — আইএলও এবং ইউএনও থেকেও পরিবেশ দূষণের কারণে সিন্থেটিক প্যাকেজিং বর্জন করার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে এ দেশের সরকার উল্টো নীতি গ্রহণ করেছে।

ফলে মালিকদের যথেচ্ছাচার ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারি নীতির জন্যই আজ চটশিল্প ও শ্রমিকদের এই দুরবস্থা। এই অবস্থা দূর করার জন্য সরকার যাতে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। শুধু শ্রমিকের বেতন কমিয়ে চটশিল্পকে বাঁচানো যাবে না। সিন্থেটিক ব্যাগের বিরুদ্ধে সত্যিকারের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কারণ খাদ্যশস্যে এবং চিনিতে সিন্থেটিক বস্তার ব্যবহার বন্ধ করতে না পারলে আড়াই লক্ষ চটশিল্প শ্রমিক এবং ৪০ লক্ষ পাটচাষীও কর্মহীন হয়ে পড়বে।

চটশিল্পে শ্রমিকদের উপর এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউটিইউসি-লেনিন সরণী সহ ছ'টি ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ৪ জুন কলকাতায় লেবার কমিশনারের দপ্তরে সারাদিনব্যাপী অবস্থান এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এর আগে নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে শ্রমমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে বন্ধ চটকলগুলি অবিলম্বে খোলার ব্যবস্থা করা, খাদ্যশস্যে এবং চিনির প্যাকেজিং-এ সিন্থেটিক ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করা, শ্রমিকদের ডি এ দেওয়া এবং জাতীয় নীতি হিসাবে চটশিল্পের মতো কৃষিনির্ভর শিল্পের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দাবি তোলা হয়। গত ৪ জুন রাজ্যের অতিরিক্ত শ্রমকমিশনার মৌখিক কিছু আশ্বাস এবং কিছু পদক্ষেপ নেবার কথা বললেও কার্যকরী কোন ব্যবস্থা বা তৎপরতা আজ পর্যন্ত নেননি। ফলে প্রয়োজন হল আরও বৃহত্তর শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা। বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে মিটিং-মিছিল, শ্রমিক কনভেনশন, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার কর্মসূচি চলছে। আগামী জুলাই মাসের শেষে হাজার হাজার চটকল শ্রমিকের কলকাতায় জমায়েত এবং আইন অমান্যের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

আজ শুধু চটকলগুলিতেই নয়, ইঞ্জিনিয়ারিং, সুতাকল, চা শিল্প সহ সমস্ত শিল্প শ্রমিকদের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে এসেছে। একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি সংকোচন ইত্যাদি চলছে। কেন্দ্রে যা-ই সরকার পরিবর্তন হোক না কেন — মানুষের জীবনে কোন পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা নেই। কারণ সমস্ত সরকারই দেশি-বিদেশি মালিকশ্রেণী এবং পুঁজিবাদের সেবা করছে। তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মুনাফা এবং লুণ্ঠনের স্বার্থে বিশ্বায়ন-উদারীকরণের উপযোগী সংস্কার কর্মসূচিকে পূর্বতন এনডিএ সরকারের মতোই বর্তমান সিপিএম সমর্থিত ইউপিএ সরকারও এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর — নির্বাচনের মুখে যাই বুলি তারা আওড়াক না কেন। পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর উপর আক্রমণও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। ফলে আজ শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ হয়ে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের পথে যেতে হবে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনই বর্তমান পর্যায়ে মালিকশ্রেণী এবং তাদের তাঁবেদার ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে এবং মালিকশ্রেণীর সেবাদাস সরকারের মালিকতোষণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

মেদিনীপুরে বিড়ি শ্রমিক শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

মালিক ও ঠিকাদাররা দীর্ঘদিন ধরে বিড়ি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করছিল। তার বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ জেলার সূতী থানার বৈষ্ণবডাঙ্গা এবং তৎসংলগ্ন বীরভূম জেলার রাজগ্রাম এলাকার বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশে ২০০২ সালের ১২ জুন পুলিশের গুলি চালনায় শহীদ হন বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামের কিশোর বিড়ি শ্রমিক কমরেড মুজিবর শেখ। এরপর আন্দোলনের চাপে আত্মসাৎ করা টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয় বিড়ি মালিকরা। তারপর থেকে প্রতি বছরের মতে এবারেও ১২ জুন সারা রাজ্যের সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শহীদ বেদীতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, সভার মাধ্যমে বিড়ি শ্রমিক শহীদ দিবস পালিত হয়।

ভগবানপুর থানার মনোহরপুর, পাইক ভেড়ী, বাড়বাসুদেবপুর, বারিয়া, সুবুদপুর, পাঁশকুড়ার ভোগপুর বাজার, তমলুকের রামতারক হাট, চিত্রা, রামচন্দ্রপুর, ঝাড়গ্রামের বিনপুর বাজার এবং মেদিনীপুর শহরের রাজার বাগান এলাকায় ঐ দিনটি মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

বিদ্যুৎ নিয়ে সিপিএমের মিথ্যাচার

মূল আন্দোলনকে দুর্বল করার চক্রান্ত

গত ২৪ মে সিইএসসি এবং ৯ জুন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিদ্যুৎ মাশুল ঘোষিত হয়েছে। এই নতুন মাশুল আদায় করা হবে আগস্ট মাসের বিল থেকে। সিইএসসি'র ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের মাশুল পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ সালের জন্য নতুন মাশুল ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ এবং ২০০৪-০৫ সালের জন্য মাশুল ঘোষণা করা হয়েছে।

এই ঘোষিত মাশুল সম্পর্কে যতটুকু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতেই জনবিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। আগস্ট মাসের বিলের বাস্তব রূপ দেখে এই ধূমায়িত বিক্ষোভ বিস্ফোরণের রূপ নিতে পারে বলে সকলেই মনে করছেন। সিপিএম ফ্রন্ট এবং সরকার এই আসন্ন বিক্ষোভের ঝড় কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে খুবই চিন্তিত। আপাতত সরকার এই বিক্ষোভ মোকাবিলায় তিনটি পথ বেছে নিয়েছে ঃ (ক) বিভ্রান্তি ছড়িয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা যে এই মাশুল বৃদ্ধির সব দায় বিগত এনডিএ সরকারের; (খ) শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ-র মাধ্যমে লোক দেখানো আন্দোলন-আন্দোলন খেলা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা যে, সিপিএম ফ্রন্টও এই মাশুলবৃদ্ধিতে দারুণ-ভাবে ক্ষুব্ধ এবং আন্দোলন করতে বদ্ধপরিকর, যেটা আসলে সত্যিকারের আন্দোলনকে দুর্বল করারই প্রচেষ্টা; (গ) রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সামান্য কিছু রিলিফ ঘোষণা করে এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের দাম বাড়েনি, একথা প্রচার করে রাজ্য সরকারের সততা ও জনস্বার্থমুখীনতা প্রমাণের চেষ্টার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আইন পরিবর্তন করা হবে বলে আশার ফানুস ঝুলিয়ে প্রকৃত আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া। উপরোক্ত বিষয়গুলোর তাৎপর্য ও গভীরতা অনুভব করার জন্য আগে সংক্ষেপে সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ঘোষিত মাশুলের মৌলিক দিকগুলো বুঝে নেওয়া দরকার।

সিইএসসি'তে কী ঘটেছে

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সিইএসসি'তে ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের মাশুল পুনর্বিন্যাস করেছে হাইকোর্টের অর্ডারের ভিত্তিতে, আর ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ ও ২০০৪-০৫ সালের জন্য নতুন করে মাশুল ঘোষণা করেছে। দেখা যাচ্ছে, কমিশন ২০০৪-০৫ সালের গড় মাশুল ইউনিট প্রতি ৪১৫ পয়সা থেকে কমিয়ে ৪০৩ পয়সা করেছে। অর্থাৎ গড়ে ইউনিট প্রতি দাম না বেড়ে দাম কমেছে ১২ পয়সা। কিন্তু এই দাম কমার ব্যাপারটা এমনই যে সাধারণ মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে, আর বড় গ্রাহকরা, শিল্পপতিরা গোঁফে তা দিতে শুরু করেছে। কারণ সাধারণ মানুষের মাশুল বাস্তবে ১ পয়সাও না কমে বেড়েছে এবং চেপেছে বিরাট বকেয়ার বোঝা। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। ১০০ ইউনিটের একজন গৃহস্থ গ্রাহকের বর্ধিত মাশুল হল ৬৭.০০ টাকা, আর প্রতি মাসে (২৪ মাসব্যাপী) তাঁকে বকেয়া দিতে হবে ৫০.৪৫ টাকা। অর্থাৎ আগস্ট মাস থেকে বেশি দিতে হবে ১১৭.৪৫ টাকা। একইভাবে একজন ৩৫০ ইউনিটের গৃহস্থ গ্রাহককে প্রতি মাসে বেশি মাশুল দিতে হবে ৩৪৩.৩০ টাকা, আর মাসিক বকেয়া ৮৫২.৪৯ টাকা। অর্থাৎ মাসে ১১৯৫.৭৯ টাকা বেশি দিতে হবে। এর সাথে যুক্ত হবে সরকারি ডিউটি। আরও একটি ঘটনা ঘটেছে সিইএসসি'র মাশুল ঘোষণায়। তা হল, স্ল্যাব বিন্যাসের পরিবর্তন। কমিশন, প্রচলিত আয়কর পদ্ধতির স্ল্যাব ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সিইএসসি'তে আবার পুরনো পদ্ধতি চালু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে পুরনো পদ্ধতি চালু করা হলে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই ঐ অবৈজ্ঞানিক স্ল্যাব পাল্টে আয়কর নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী স্ল্যাব চালু করা হয়েছিল। পুরনো স্ল্যাব পদ্ধতিতে সব গ্রাহক সব স্ল্যাবের সুযোগ পাবে না। দ্বিতীয়ত, ইউনিটের হেরফেরে স্ল্যাব পাল্টে গেলে গ্রাহকদের অনেক টাকা বেশি দিতে হবে। কারণ প্রত্যেকেরই দাম

নির্ধারিত হবে নতুন স্ল্যাব অনুযায়ী। এখন প্রশ্ন হল, দাম কমে গেল, তবুও সাধারণ গ্রাহকদের ঘাড়ে এমন দুর্ভোগের বোঝা চেপে গেল কী করে? সিইএসসি'র ক্ষেত্রে কারণ তিনটি। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী —

(১) ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের মাশুল নতুন করে নির্ধারণ,

(২) ২০০৩-০৪ সালের মাশুল অভিন্ন প্রক্রিয়ায় গড়ে ২৫ পয়সা বৃদ্ধি,

(৩) তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ করে অভিন্ন মাশুল নীতি অনেকখানি প্রয়োগ করা।

উপরোক্ত তিনটি কারণ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ভূমিকার একটু আলোচনা হওয়া দরকার। হাইকোর্টের রায় প্রয়োগে ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের মাশুল সাধারণ গ্রাহকদের আরও বাড়ল কেন? হাইকোর্টের রায়ে কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, ২৯(৩) ধারা [যা বর্তমানে ৬২(৩) ধারা] যথাযথভাবে প্রয়োগ করে নতুনভাবে মাশুল বিন্যাস করতে। বিষয়টি স্থির করার জন্য কমিশন শুনানি করেছিল গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩। সেই শুনানিতে ২৯(৩) ধারা অনুযায়ী সিইএসসি থেকে তথ্য সরবরাহ করার অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু সিইএসসি সেই তথ্য সরবরাহ করেনি। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি তৎকালীন বিদ্যুৎসচিব ডঃ কে কে বাগচী সিইএসসি'র পক্ষ নিয়ে তাঁর লিখিত বক্তব্যে জানান যে, রাজ্য সরকার মনে করে ২৯(৩) ধারায় যে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই রাজ্য সরকারের প্রস্তাব হ'ল, এ্যাডহক ভিত্তিতে ক্ষুদ্র গ্রাহকদের ক্ষেত্রে দাম ২% বাড়িয়ে দিয়ে বড় গ্রাহকদের অর্থাৎ শিল্পপতিদের ২% দাম কমিয়ে নতুন করে ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের মাশুল ঘোষণা করা হোক্। এবার দেখুন, কমিশন কী বলছে। কমিশন তার মাশুল ঘোষণায় বলছে যে, তথ্য না পাওয়ায় তারা এ্যাডহক ভিত্তিতে নতুন করে ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ এর মাশুল স্থির করেছে। ফলে সরকারি প্রস্তাবের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? দ্বিতীয়ত, ২০০৩-০৪ সালে যখন কমিশন অভিন্ন পদ্ধতিতে ইউনিট প্রতি ২৫ পয়সা হারে অন্তর্বর্তীকালীন মাশুলবৃদ্ধি করেছিল সেদিন রাজ্য সরকার ও বামফ্রন্ট তাকে সমর্থন করে বলেছিল, এটা ফাইনাল নয়, তাই বিরোধিতার মানে হয় না। এবার কমিশন সেই ২৫ পয়সা বৃদ্ধিকেই অভিন্নভাবে আদায়ের স্থায়ী নির্দেশ দিয়েছে। উপরোক্ত দু'টি কারণেই সিইএসসি'তে সাধারণের ঘাড়ে ২০০০-০১ সাল থেকে মোট ৫২ মাসের বকেয়া চেপে গিয়েছে, এবং যুক্ত হয়েছে ২০০৪-০৫ সালের বর্ধিত মাশুলের বোঝা। এখানেও গড় দাম কমেছে। কিন্তু অভিন্ন মাশুলনীতি প্রয়োগের ফলে দাম কমেছে বড় গ্রাহকদের, আর দাম বেড়েছে ছোট গ্রাহকদের। অর্থাৎ অভিন্ন মাশুল নীতি বা তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপের নীতিই হল গরিব মধ্যবিত্তের উপর মাশুলের ও বকেয়ার বোঝা চেপে যাওয়ার মূল কারণ।

কী ঘটেছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে

একটু তলিয়ে দেখলেই এ সত্য বেরিয়ে আসবে যে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদেও একই ঘটনা ঘটেছে। শুধু ধূর্ততার পার্থক্য। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে কী ঘটেছে? পর্ষদের ক্ষেত্রে মাশুল ঘোষিত হয়েছে ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছরের। ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের মাশুল নতুন করে নির্ধারণ করা হয়নি। এর ফলে পর্ষদ গ্রাহকদের ৫২ মাসের বকেয়া বর্তমানে দিতে হচ্ছে না। কিন্তু দিতে হবে না, তা নয়। কারণ, রাজ্য সরকারের নির্দেশে বিদ্যুৎ পর্ষদ সিইএসসি'র মতোই ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালে মাশুলবৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে। এই মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। যদি সিইএসসি'র মতো রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদও এই মামলার ফলে মাশুলবৃদ্ধি এবং নতুন করে মাশুল বিন্যাসের অনুমতি পায়, তা হলে একইভাবে বকেয়ার বোঝা চেপে যাবে পর্ষদের ছোট গ্রাহকদের উপর, আর দাম কমবে বড় গ্রাহকদের। দ্বিতীয়ত, কমিশন ২০০৩-০৪ সালের জন্য একইভাবে অভিন্ন পদ্ধতিতে ৫২ পয়সা অন্তর্বর্তীকালীন মাশুল বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং একই যুক্তিতে সমর্থন যুগিয়ে ছিল রাজ্য সরকার। একইভাবে তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপের নীতির ভিত্তিতে সব গ্রাহকদের ক্ষেত্রেই বর্তমানে ৫২ পয়সা বৃদ্ধিকে আইনসম্মত করেছে কমিশন। অর্থাৎ সাধারণের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হল, সেই টাকা তুলে দেওয়া হল শিল্পপতিদের হাতে। তৃতীয়ত, এখানেও ২০০৪-০৫ সালে দেখানো হয়েছে, গড়ে ২ পয়সা হারে মাশুল কমেছে। কিন্তু তার সুফল পেয়েছে বড় গ্রাহকরা, বৃহৎ শিল্পপতিরা। তাদের দাম কমেছে ইউনিট ৫ থেকে ৭ পয়সা হারে, কিন্তু গরিব-মধ্যবিত্তের, কৃষকের দাম বেড়েছে। কৃষিতে দাম বেড়েছে ৪৫২ টাকা। আবার রিবেট কমিয়ে ইউনিট প্রতি ৫ পয়সা দাম বাড়ানো হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও যারা প্রচার করছে পর্ষদে তেমন কিছু দাম বাড়েনি, তাদের জন্য আরও ভয়াবহ এক সরকারি চালাকির খবর আছে। সেটা হল, কমিশন তার মাশুল ঘোষণায় জানিয়েছে যে, পর্ষদ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ না করার ফলে ৩৭৩ কোটি টাকার মাশুলবৃদ্ধির ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আন্দোলনের চাপ কমে গেলেই একইভাবে পারস্পরিক ভর্তুকি কমাবার প্রক্রিয়ায় ৩৭৩ কোটি টাকার সবটাই চেপে যাবে গরিব, মধ্যবিত্ত, গৃহস্থ, কৃষক, ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, ছোট দোকানদারদের উপর। অর্থাৎ পর্ষদেও গড় দাম কমার সমস্ত সুযোগই পাচ্ছে বৃহৎ শিল্প, বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং আগামী দিনে তারা আরও পাবে। আর, পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপের নীতিতে দাম বেড়েছে গরিব, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র শিল্প আর কৃষকের। আগামী দিনে আরও বাড়বে এদেরই। ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালে মাশুলবৃদ্ধির অনুমতি পেলে সেই রায়ের ভিত্তিতে আরও মাশুলের ও বকেয়ার বোঝা চেপে যাবে উপরোক্ত গরিব, মধ্যবিত্ত গ্রাহকদের উপর। পার্থক্য শুধু সময়ের। ধূর্ততার সাথে সময়ের পার্থক্য করে গ্রাহকদের দু'ভাগ করে দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা চালিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সিপিএম ফ্রন্ট। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পিছন থেকে এটা করেছে সরকারি শক্তি। তাই কমিশন ৯ জুন '০৪ পর্ষদের মাশুল ঘোষণায় কেবল ১৬নং চ্যাপ্টার প্রকাশ করেছিল। ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যেও একটা পাতা। স্বাক্ষর ছিল না কমিশনের একজন সদস্যেরও। কারণ, দ্রুততার সাথে কাজ করেও সরকারি চাপে ঘোষণাপত্র নতুনভাবে তৈরি করে ৯ জুন তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি কমিশনের পক্ষে। পর্ষদের মাশুল ঘোষণায় কতখানি সরকারি হস্তক্ষেপ কাজ করেছে — এটাই তার প্রমাণ।

মাশুল ঘোষণা থেকে কী পাওয়া গেল

সকলেই জানেন, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) বিদ্যুৎ শিল্পকে তিনভাগে, অর্থাৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বণ্টনে বিভক্ত করে বাণিজ্যিক কোম্পানি হিসাবে গড়ে তোলা; (খ) সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যনীতির ভিত্তিতে মাশুল নির্ধারণ করা; (গ) তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ করে সকলের দাম সমান করার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার দাম কমিয়ে দেওয়া। কমিশন কর্তৃক ঘোষিত মাশুল নির্ধারণে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, কমিশন মাশুলের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই সিইএসসি ও পর্ষদের মাশুল ঘোষণা করেছে। সিপিএম ফ্রন্ট ও সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, 'এ কাজ করেছে কমিশন, রাজ্য সরকার এই মাশুলনীতির তীব্র বিরোধী। আর কমিশন এনডিএ সরকারের বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ অনুযায়ী এই জনস্বার্থবিরোধী মাশুল ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারের কী করার আছে? রাজ্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে পর্ষদকে ভেঙ্গে দেওয়া রুখতে। কারণ পর্ষদকে ভেঙ্গে দিলে বেড়ে যাবে মাশুল, আর শ্রমিক- কর্মচারীর উপর নেমে আসবে ছাঁটাইয়ের কোপ। এই জনস্বার্থবিরোধী

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরাক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল

আমেরিকাকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করল

তের জন আন্তর্জাতিক বিচারকের উপস্থিতিতে ৮ মে নিউ ইয়র্কের কুপার ইউনিয়ন হলে ইরাক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে আমেরিকাকে দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে। সারাদিনব্যাপী শুনানির পর আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী আমেরিকাকে দোষী সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এক বছর আগে দুনিয়াজোড়া যুদ্ধবিরোধী সমাবেশগুলিতে ১৯৬৭ সালে গঠিত বার্ট্রান্ড রাসেলের ভিয়েতনাম ট্রাইব্যুনালের অনুকরণে ইরাক ট্রাইব্যুনাল গঠন নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। ইরাকে সাদ্দাম হুসেন সরকারের পতনের পর ২০০৩ সালে ইস্তাম্বুলে তুরস্কের যুদ্ধবিরোধীদের সমাবেশে যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত একটি গণআদালত গঠনের ব্যাপারে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে মেক্সিকো, জাপান, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, তুরস্ক এবং বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে তিন দিনের শুনানি হয়ে গেছে। নিউইয়র্কের কুপার ইউনিয়ন হলে আর একটি শুনানি হয়েছে। এ সংক্রান্ত আইনকানুনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার জন্য ফিলিপাইনস ও ব্রিটেনে দু'টি বৈঠক হয়। পরবর্তী শুনানি হয়েছে ১৯ জুন বার্লিন শহরে এবং ২৬ আগস্ট রিপাবলিকান দলের জাতীয় কনভেনশনের তিনদিন আগে নিউইয়র্ক শহরে শুনানি হবে। ডিসেম্বর মাসে রোম শহরে আর একটি শুনানি হবে।

৮ মে নিউইয়র্কের কুপার ইউনিয়ন হলে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনেই একের পর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে ওঠেন। ২০০৩ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা কী কী ধরনের নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করেছে, সিনেমা স্লাইডের সাহায্যে সেসব অস্ত্র দেখানো হয়। নিউ ইয়র্ক শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এপ্রিল হার্ভে যুদ্ধচলাকালীন বাগদাদে উপস্থিত ছিলেন। অ্যাটর্নি জেনিফার রিধা তাঁকে গুরুতর আহত ১০ বছর বয়সী ইরাকি কিশোর আলি ইসমাইল আব্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্লাইডে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালের শয্যায় আব্বাস শুয়ে আছে। সে তার দু'টি বাহুই হারিয়েছে। আগুনে পুড়ে তার পুরো মুখটাই কালো হয়ে গেছে।

ডাঃ এপ্রিল হার্ভে শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, আব্বাস জানিয়েছে যদি সে তার বাহু দুটি ফিরে না পায় তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। এই কথাগুলি উচ্চারিত হবার পর শ্রোতাদের আসন থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো দীর্ঘনিঃশ্বাস ও চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসে। রিধার প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ হার্ভে জানান, দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি বোমার আগুনে আব্বাসের মুখ পুড়ে গেছে।

বাগদাদ শহরের শহরতলিতে অসামরিক এলাকায় আব্বাস তার পরিবারের সঙ্গে বাস করতো। এ ধরনের এলাকায় দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি বোমা ফেলার উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। অতএব, এটা পরিষ্কার যে পেন্টাগন একটা যুদ্ধাপরাধের ঘটনা ঘটিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা সাংবাদিক ডাঃ মার্টিনেজ জানান, ''অবরুদ্ধ ফালুজা শহরে আমার চোখের সামনে একজন মার্কিন বন্দুকবাজ একজন বৃদ্ধকে গুলি করে। বৃদ্ধ লোকটি অবশ্যই একজন অসামরিক ব্যক্তি। বৃদ্ধ মানুষটি রাস্তার ধারে পড়েছিলেন এবং তাঁর সারা শরীর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে সাহায্য করার জন্য কাছে এগিয়ে আসার সাহস পায়নি। কারণ, যারাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে বন্দুকবাজটি তাদেরকেই লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে। সুতরাং দূর থেকে বৃদ্ধের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখা ছাড়া তাঁর পরিবারের লোকেদের আর কিছু করার ছিল না।''

ক্ষুব্ধ মার্টিনেজ, দখলদারি সম্পর্কে তাঁর মত পরিবর্তিত হবার কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, ''গত বছর যে ক'জন ইরাকির সঙ্গে আমার মত বিনিময় হয়েছে তাঁরা মনে করেছিলেন, ইরাকের মঙ্গলার্থে আমেরিকাকে আরও সুযোগ দেওয়া দরকার। আজ সেসব ইরাকিরাই বলছেন, শীঘ্রই আমেরিকানদের ইরাক ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার, নতুবা আমরাই প্রতিরোধে নামবো।''

একসময় মার্টিনেজও মনে করতেন, মার্কিন দখলদারি থেকে শুভ কিছু মিলতে পারে। আর এখন তাঁর মনও বলছে, ''দখলদারির অবসান হোক। এখনই (মার্কিন সেনা) ইরাক ছাড়ো।''

বাগদাদের একজন স্থানীয় নেতা তাঁকে (মার্টিনেজকে) বলেছেন, ''সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। এর পর আমার লোকজনদের আয়ত্তে রাখা আমার পক্ষেও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।''

বেলজিয়ামের ডাক্তার গিট ভন্ মুরাটার অনেক দিন ইরাকে এসেছেন। তিনি প্রথম ইরাকে আসেন অর্থনৈতিক অবরোধ চলার দিনগুলিতে। এরপর তিনি ইরাক আসেন ২০০৩ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে। নির্বিচার বোমা বর্ষণ ও দখলদারি শুরু হবার দিনগুলিতে তিনি ইরাকেই ছিলেন। এরপর তিনি আসেন ২০০৩ সালের জুলাই মাসে এবং এ বছরের মার্চ মাসে।

আন্তর্জাতিক জুরিদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, ''সত্য ঘটনা হল, জেনেভা কনভেনশনের শর্তাবলীকে মানা হচ্ছে না। গত বছর ইরাক দখলের দিন বাগদাদ শহরে গুরুতর আহত কিছু শিশুকে অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে উন্নত যন্ত্রপাতি আছে এমন এক হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছিল, পথে বিনা প্ররোচনায় মার্কিন সেনারা অ্যাম্বুলেন্সের উপর গুলি চালালে গুরুতর আহত শিশুগুলি অধিকতর আঘাত নিয়ে ১০ মিনিট পরে পুরনো জায়গাতেই ফিরে আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত শিশুগুলির শরীরই শুধু ছুঁয়েছিলাম।''

ডাঃ ভন মুরাটার বলেন, এখন ইরাকে শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। কারণ প্রচণ্ড খাদ্যাভাব এবং ক্রয়-ক্ষমতার অভাবজনিত কারণে দখলীকৃত ইরাকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক নীচে নেমে গেছে। অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গোটা পরিকাঠামোই নিম্নমুখী হয়েছে। এক বছর হলো সেই অবরোধ উঠে গেছে, কিন্তু ওষুধপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি ঘটেনি।''

''তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চিকিৎসা সাহায্য'' কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত এই বেলজিয়ান ডাক্তার যুদ্ধবিরোধীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ''অবিলম্বে দখলদারি অবসানের দাবিতে রাস্তায় নেমে জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করুন। আইনি প্রক্রিয়া তখনই সফল হবে, যখন জনসাধারণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে পারবেন। শুধুমাত্র আইনের কচকচানি দিয়ে কিছু হবে না।'' শ্রোতারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাততালি সহযোগে ডাক্তার মুরাটারের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান।

২৫ জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সফরের বিরুদ্ধে আঙ্কারা শহরে ২০ হাজার মানুষের বিশাল সমাবেশে বুশের কুশপুতুল দাহ করা হচ্ছে।

দখলীকৃত ইরাকে মার্কিন জোট বাহিনীর নানারকম অত্যাচার সম্পর্কিত একটি ৭ মিনিটের ব্যঙ্গচিত্রও দেখানো হয়।

সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে এক বাক্যে জুরিরা আমেরিকাকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

শেষ শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ২০ মার্চ ২০০৫ ইস্তাম্বুল শহরে। দু'বছর আগে ঐদিনটিতে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনা ইরাকে অভিযান চালিয়ে ইরাক দখল করেছিল।

(সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড (নিউ ইয়র্ক) ২০ মে ২০০৪)

গুজরাটে ছাত্রীহত্যা ঃ ভারতে আইনের শাসনের বড়াই করা চলে না

একের পাতার পর

নেই। তাই এবার বিভিন্ন মহল থেকেই গুজরাট ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করা হয়েছে। এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটিও একই দাবি তুলেছে। গুজরাটে সংখ্যালঘুদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে পুলিশ প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রমাণ লোপ করা ও বেস্ট বেকারীসহ যে কয়েকটি মামলা বিভিন্ন কোর্টে চলছিল সেগুলিতেও সাক্ষীদের ভয় দেখানো প্রভৃতি কারণে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট পুলিশ ও প্রশাসনকে শুধু তীব্র ভর্ৎসনাই করেনি, মামলাগুলিকে গুজরাট থেকে অন্যত্র সরানোরও নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ-প্রশাসনের অপরাধমূলক পক্ষপাতিত্ব এবং তার প্রতি বিচারপতিদের এই অনাস্থার নজির এদেশেও খুব বেশি নেই।

মোদী হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে একইভাবে ২০০২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর একজনকে হত্যা করে গুজরাট পুলিশ, ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু আদালতে পুলিশ ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণই দিতে পারেনি, ছাড়া পান সকলেই। একই অজুহাতে ২০০৩ সালের ১৩ জানুয়ারি একজনকে হত্যা করে গুজরাট পুলিশ। যথারীতি ঐ হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণই তারা দিতে পারেনি। তাই গুজরাট পুলিশকে বাদ দিয়েই এই সর্বশেষ হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আবার ব্যাপারটিকে শুধু পুলিশের বাড়াবাড়ি বলে ধরে নিলে ভুল হবে। গুজরাটে সংখ্যালঘু হত্যাকাণ্ডে পুলিশের জড়িয়ে পড়া কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং তা পুলিশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর যেমন নির্ভর করেনি, তেমনি এই হত্যাকাণ্ডগুলির পিছনেও প্রশাসন তথা মোদী নেতৃত্বের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ এতে সবচেয়ে বেশি লাভবান তো তাঁরাই হন, যেটা এই ধরনের অন্যান্য 'এনকাউন্টার'গুলির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে অক্ষরধাম মন্দির হত্যাকাণ্ডে, পার্লামেন্ট আক্রমণের ঘটনায় একই জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি। 'জঙ্গিদের' সকলকে পুলিশ খুন করেছে, একজনও বাঁচেনি। সংঘর্ষে মৃত্যুর এই তত্ত্ব পুলিশ-প্রশাসন আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরেই চালিয়ে আসছে। পাঞ্জাবে 'জঙ্গি' দমনের নামে একসময় এ জিনিস পাঞ্জাব পুলিশের কাছে জল-ভাত হয়ে উঠেছিল। বলি হয়েছিল হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ যুবক। পশ্চিমবঙ্গেও ৭০-এর দশকে 'সাজানো সংঘর্ষে' বহু নকশালপন্থীদের, এমনকী নকশালপন্থী সন্দেহে নিরীহ যুবকদের পুলিশ খুন করেছে। এ জিনিস আজও ঘটছে।

উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদ দমন করার নামে পুলিশ কি এভাবে শুধু সন্দেহের বশে কাউকে খুন করতে পারে? আইন অনুযায়ী পারে না বলেই পুলিশ আত্মরক্ষার অজুহাত তুলে সংঘর্ষের গল্প ফেঁদে অবাধে খুন করে চলেছে। সরকারি দলগুলি ও সরকার সব জেনেও নীরব শুধু নয়, গুজরাট, পাঞ্জাব সহ অন্যান্য রাজ্যের ঘটনা প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক মদতেই পুলিশ এ জিনিস করছে। সেজন্যই যদি কখনও নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত থেকে পুলিশের শাস্তির আদেশও হয়, কোনও সরকার পুলিশের ক্ষেত্রে সেই আদেশ কার্যকর করে না, যার নজির এই পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ফ্রন্ট শাসনেও পাওয়া গেছে। তবুও ভারতের রাষ্ট্রনেতারা ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনের শাসনের বড়াই করেন, মানবাধিকারের নামে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের সকল সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশেই আইনের শাসনের ভিতরকার চেহারা এমনই কদর্য ও স্বৈরাচারি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র আজ আর সভ্য শাসন ব্যবস্থা দিতে পারছে না, ইতিহাসে এর ভূমিকা নিঃশেষিত। তাই এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেতে পারে না।

রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই কমিশনের রায় বাতিল করতে পারে

চারের পাতার পর

আইন পাল্টানোর চেষ্টা করে চলেছে ফ্রন্ট সরকার। তাই একদিকে আন্দোলন, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে আইন বাতিলের জন্য চাপ দেওয়া।'

বিদ্যুৎ কমিশন কে গঠন করেছে?

সকলেরই এই কথা জানা যে, এনডিএ সরকারের বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ কার্যকর হয়েছে ১০ জুন ২০০৩ থেকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯৮ অনুযায়ী কমিশন গঠন করা হয়েছে ১৯৯৯ সালে। এ কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্ব-ইচ্ছায় করেছে। কারণ তখন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না কমিশন গঠনে। তাই ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্যে তখন কমিশন করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, এ কথাও সিপিএম নেতৃবৃন্দ ভালোভাবেই জানেন যে, এই কমিশনের তিনজন সদস্যই আগেও ছিলেন রাজ্য সরকারের দ্বারা মনোনীত। বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এও একই কথা বলা হয়েছে। তৃতীয়ত, এই কমিশন সবসময়ই রাজ্য সরকারের কাছে দায়বদ্ধ। চতুর্থত, ১০৮নং ধারায় স্পষ্টই বলা হয়েছে, কমিশনের কোন কাজ যদি জনস্বার্থবিরোধী হয়েছে বলে রাজ্য সরকার মনে করে, তাহলে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়ে কমিশনের সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে। তাহলে রাজ্য সরকার ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের এই জনস্বার্থ বিরোধী রায় বাতিল করে দিচ্ছে না কেন? এর প্রধান কারণ হল, সিপিএম পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যুৎ শিল্প বাণিজ্যিকীকরণের পুরোপুরি সমর্থক। তাই ওড়িশার পরে পশ্চিমবঙ্গই হল ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাজ্য যেখানে 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু হওয়ার আগে থেকেই এই আইনের মূল বিষয়গুলি যথা কমিশন গঠন, বাণিজ্যিকীকরণ এবং অভিন্ন মাশুল চালু করার কাজ চালু করা হয়েছে এবং বর্তমান বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ভালোভাবে প্রয়োগ করার জন্য ধূর্ততার সাথে চেষ্টা চলছে।

বাণিজ্যিকীকরণের স্বার্থে পর্ষদকে আগেই ভাঙা হয়েছে

সিপিএমের অন্যতম নেতা শ্যামল চক্রবর্তীর লেখা বইতে স্পষ্টতই স্বীকার করা হয়েছে যে, 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু হওয়ার আগেই পর্ষদকে দুইভাগে ভাগ করে বিদ্যুৎ পর্ষদকে বণ্টন কোম্পানি এবং পিডিসিএল'কে উৎপাদন কোম্পানিতে পরিণত করা হয়েছে। আরইসি গঠন ও সমবায় গঠন করে এই বাণিজ্যিক বিভাজনকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে — যার ফলে পর্ষদ আগের আইন অনুযায়ী ৩% আয়ের পরিবর্তে এখন ১৬% আয়ের অর্থাৎ বিশাল পরিমাণ মাশুল বৃদ্ধির অধিকার পাচ্ছে ও সেইভাবেই মাশুল বাড়ানো হচ্ছে। সেই কারণে পর্ষদকেও সিইএসসি'র সাথে পাল্লা দিয়ে মাশুল বাড়াতে হচ্ছে। এইভাবেই বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। এই বাণিজ্যিকীকরণের জন্যই পর্ষদে হ্রাস পেয়েছে শ্রমিক- কর্মচারীর সংখ্যা। সিটুর প্রত্যক্ষ সমর্থনে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী বন্ধ করে দিয়েছে মুলাজোড় উৎপাদন কেন্দ্র। ২৩৭০ জন কর্মীকে ভি আর এস বা স্বেচ্ছাবসর দেবার জন্য সিটু নিজে সিইএসসি'র ম্যানেজমেন্টকে দাসখত দিয়েছে। একথা সকলেরই জানা।

সিইএসসি ও পর্ষদের মাশুলে এত ফারাক কেন?

প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সিইএসসি ও পর্ষদের মাশুলের এত ফারাক কেন? সিইএসসি ও পর্ষদের মাশুলের মধ্যে ফারাক দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে যে, সিইএসসি'র মাশুল ব্যাপক বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও কমিশন দায়ী। রাজ্য সরকার যেন এই অশুভ চক্রের ঘোরতর বিরোধী! ঘটনা হল— সিইএসসি'র সাথে পর্ষদের মাশুলের ফারাকের তিনটি কারণ (১) বজবজ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি, (২) ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের মাশুল হাইকোর্ট কর্তৃক বৃদ্ধি এবং ২৯(৩) ধারার অপপ্রয়োগ, (৩) বণ্টন ও সঞ্চালনের ক্ষতির হিসাবে অস্বচ্ছতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়ের মাশুল নির্ধারণ একই প্রক্রিয়ায় করা হয় না। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পুঁজি লগ্নির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে মাশুল নির্ধারিত হয়। সকলেরই হয়তো স্মরণে আছে, গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী বজবজ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরে সরকারের সঙ্গে চুক্তির থেকে অনেক বেশি খরচ দেখায়। তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর সেন সিইএসসি'র দেখানো বর্ধিত বিনিয়োগের যুক্তি মানতে অস্বীকার করেন। এটা গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর মিথ্যাচার বলে মনে করেন। কারণ বিনিয়োগ বেশি মেনে নিলেই বিদ্যুৎ মাশুল অনেক বেড়ে যাবে বলে তিনি জানতেন। বিষয়টি সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। একথাও অনেকেই জানেন, আর পি গোয়েঙ্কা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শরণাপন্ন হন। অবশেষে ডঃ সেনকে মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নিতে হয়। কমিশন ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের মাশুল ঘোষণার পরেই সিইএসসি আরও মাশুলবৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। সেই মামলায় বজবজের বিষয়টি এবং বণ্টন-সঞ্চালনের ক্ষতির বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেয়। তখন বর্তমান বিদ্যুৎমন্ত্রীকে বার বার মামলাটিতে অংশ নিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধূর্ততায় রাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎমন্ত্রী মামলায় অংশ না নিয়ে বজবজে সিইএসসি'র বর্ধিত ব্যয়ের দাবি ও বর্ধিত বণ্টন-সঞ্চালনের ক্ষতির দাবি হাইকোর্ট থেকে আদায় করে নেবার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। ফলে এত বড় পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর গত ১ সেপ্টেম্বর '০৩ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২৯(৩) ধারার ভিত্তিতে নতুন করে ঐ সালের জন্য মাশুল নির্ধারণ করতে বলে। সেই শুনানিতে ১৬ ডিসেম্বর '০৩ রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ সচিব লিখিতভাবে জানান যে, ২৯(৩) ধারা প্রয়োগের সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। তাই ক্ষুদ্র গ্রাহকদের ২% মাশুল বাড়িয়ে, বৃহৎ গ্রাহকদের ২% মাশুল কমিয়ে দিয়ে ২৯(৩) ধারাকে এ্যাডহক প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা হোক ঃ

''We would suggest to the Hon'ble Commission to take the 1998 tariff structure as the base, retain the same structure for 2000-01 and make small modification of the percentage allocations, increasing by about two percentage points or so for LT consumer classes and decreasing by about two percentage points or so for HT consumer classes to arrive at 2001-02 tariff structure. This way the basic purpose of the section 29(3) or 62(3) will be satisfied. (State Govt. suggestions, 16.12.03)

কমিশন রাজ্য সরকারের এই উপদেশ মাথা পেতে নিয়ে তার রায়ে বলেছে, ''…These years i.e. 2000-01 and 2001-02 are long over and such several dates required to determine exactly the different parameters, are neither available nor can be made available … Keeping in view of the above, the Commission has now undertaken its exercise for fixing the differential tariff within the above constraints and as adhoc decisions cannot be avoided in certain matters. While differentiating the tariff, under such circumstances, the Commission has used the best judgment in actuating differentiation''।

এ থেকেই বোঝা যায়, কমিশন রাজ্য সরকারের নির্দেশেই ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের নতুন করে মাশুল নির্ণয়ের নামে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। অপরদিকে কমিশন রাজ্য সরকারের চাপে ৩৭৩ কোটি টাকা পর্ষদের মাশুলবৃদ্ধি চেপে রেখেছে, যা পরে বাড়ানো হবে। তার ফলেই সিইএসসি ও পর্ষদের মাশুলের মধ্যে ফারাক বলে মনে হচ্ছে।

রাজ্য সরকার কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে চাইছে

প্রকৃতপক্ষে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের সব কথা না জানার সুযোগ নিয়ে কমিশনকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে একদিকে শিল্পে লগ্নীকারীদের স্বার্থে মাশুলবৃদ্ধি, অপরদিকে দেশি শিল্পপতি এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বার্থে মাশুল কমিয়ে বর্ধিত মাশুলের সমস্ত বোঝাটাই রাজ্যের গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। সকলেই জানেন, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু হওয়ার আগেই রাজ্য বিধানসভায় 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন ১৯৯৮ সংশোধনী পশ্চিমবঙ্গ ২০০১' নামক বিল পাশ করিয়েছিল।

রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেই কমিশনের রায় বাতিল করতে পারে

কিন্তু ভাবখানা এমন দেখানো হচ্ছে যে, সরকার কী করতে পারে? রাজ্য সরকার তো চেষ্টা করছে নয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ পরিবর্তন করতে, কিন্তু এর জন্য কিছু সময় তো লাগবে। কিন্তু কমিশন সায় দিল না। তড়িঘড়ি মাশুল ঘোষণা করে দিল। এটা আর একটি গোয়েব্লসীয় মিথ্যা প্রচার। রাজ্য সরকার ভাল করেই জানে, কমিশনের উপায় নেই দেরি করার। কারণ বর্তমান বিদ্যুৎ আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, লাইসেন্সির আবেদনের ১২০ দিনের মধ্যে মাশুল ঘোষণা করতে হবে। ২৪ মে ও ৯ জুন সেই শেষ দিন। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর কী পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চলছে? নির্বাচনের আগে যে সিপিএম বলেছিল, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল করতে হবে — তারাই আজ বলতে শুরু করেছে, বাতিল নয় সংশোধন চাই। কী সংশোধনই বা তারা চায়? প্রকৃতপক্ষে সংশোধন চায় বিদ্যুৎ পর্ষদের কাঠামো পরিবর্তনে আরো কিছু সময়, আর রাজ্য সরকারের আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। চায় না বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে। চায় না বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল করে বিদ্যুতে বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধ করতে। চায় না 'ধাপে ধাপে পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ' কথাটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে, পর্ষদগুলোকে কোম্পানিতে পরিণত না করতে। চায় না কোম্পানিগুলোর কমপক্ষে ১৬% মুনাফা বন্ধ করতে। চায় না শ্রমিক-কর্মচারী হ্রাস বন্ধ করতে। চায় না 'the purpose for which the supply is required' (অর্থাৎ 'বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য') এই কথাটি ভিত্তি করে মাশুল নির্ধারণের নীতি স্থির করতে। চায় না সরকারি ভর্তুকির দায়িত্ব নিতে। সর্বোপরি চায় না উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বণ্টনে বেসরকারি অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে। তাই এই দোষ স্খালনের চেষ্টা। যদি সময়ের অভাবটাই বড় সমস্যা হোত তা হলে বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের রায় বাতিল করে দিয়ে কেন্দ্রের বন্ধু সরকারকে রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পরিস্থিতির কথা লিখিতভাবে জানিয়ে অবিলম্বে জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন বাতিলের জন্য দাবি জানাতে পারত, কিন্তু কোনটাই সিপিএম সরকার করেনি। স্পষ্টতই করতে অস্বীকার করেছে।

সাপকে বলছে কাটতে আর ওঝা সেজে ঝাড়তে চাইছে

সরকার ধূর্ততার সাথে মনোনীত কমিশনকে দিয়ে লগ্নীকারী শিল্পপতি ও বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে প্রতি বছর জনগণের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে, আর নিজে সাধু সেজে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে আন্দোলন- আন্দোলন খেলা করে একমাত্র ত্রাতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে সেই পুরানো খেলা। একদিকে সিটুকে দিয়ে আন্দোলনের ম্যাজিক দেখিয়ে আন্দোলনের শক্তিকে দুর্বল করে দেবার, অন্যদিকে সরকারি ডিউটিতে ছাড় আর ইন্সটলমেন্টের (কিস্তি) সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেবার প্রলেপ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ কে মেনে নিতে বাধ্য করানো এই দুই চেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। এ যেন সাপকে কাটতে বলে ওঝা সেজে বিষ ঝাড়ার নাটক।

সিপিএম-এর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে রুখতেই হবে

এ এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় সিপিএমের এই ষড়যন্ত্রের কারণ কী? এ কথা আজ পরিষ্কার, সিপিআই(এম) বিপ্লবের ঝাণ্ডা তো বহন করেই না, এমনকী আজ আর গণআন্দোলনের ঝাণ্ডাও বহন করে না। আজ তারা পুঁজিবাদী পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেকোন ভাবেই হোক কেন্দ্রের ক্ষমতা চায়। পশ্চিমবঙ্গে ২৭ বছরের রাজত্ব তাদের এত দূর ক্ষমতালোভী করে তুলেছে যে, জনগণের অন্যতম প্রধান শত্রু কংগ্রেসের আজ সে শুধু বন্ধু নয়, পরামর্শদাতা। দেশি - বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে আজ সে নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণে সদাব্যস্ত। তাই বিশ্বায়নের পরিপূরক বিদ্যুৎনীতি, বাণিজ্যিক বিদ্যুৎনীতিই আজ সিপিএম ফ্রন্টের নীতি — এ কথা বুঝেই রাজ্যের সমস্ত গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কৃষক, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এক কথায় সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সিপিএমের এই ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং সাথে সাথে ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের অন্যায় রায় বাতিল ও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ দাবিপত্র পেশ

দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী সাতটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন — ইউ টি ইউ সি (এল এস), এ আই সি সি টি ইউ, এ আই টি ইউ সি, সি আই টি ইউ, এইচ এম এস, টি ইউ সি সি, ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে গত ২৬ মে যৌথভাবে কেন্দ্রে সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকারের শ্রমমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করে অসহায় শ্রমজীবী মানুষদের দুর্দশা মোচনে তৎপর হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। এই প্রতিনিধি দলে ইউ টি ইউ সি (এল এস)-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

স্মারকলিপিতে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পানীয় জল সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, যাতায়াত ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রয়োজনীয় সরকারি বিনিয়োগ করার দাবি জানানো হয়।

নেতৃবৃন্দ প্রত্যাশা করেন, এই নতুন সরকার দানবীয় 'পোটা' এবং 'এসমা' আইন — যা দিয়ে গণআন্দোলনের উপর মারাত্মক আঘাত হানা হয় — তা বাতিল করবে।

বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিয়ন ও ফেডারেশন যৌথভাবে যে ৮ দফা দাবি জানিয়ে আসছে তা তুলে ধরা হয়েছে। দাবিগুলি হল ঃ

১। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা এবং লাভজনক করা সম্ভব এমন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে;
২। শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং মালিকদের স্বার্থে শ্রমআইন পরিবর্তন করা চলবে না;
৩। কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থে সামগ্রিক আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং ন্যূনতম বেতনক্রম এবং সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে;
৪। কর্মহীনতা এবং বেকারত্ব সৃষ্টিকারী নীতি গ্রহণ করা চলবে না;
৫। অসংগঠিত ক্ষেত্র সহ সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে হবে;
৬। আমদানির উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে;
৭। বোনাস আইনের উর্ধ্বসীমা বাতিল সংক্রান্ত সংশোধনী আনতে হবে এবং
৮। ক্ষুদ্র সঞ্চয়, জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমানো টাকার ১২ শতাংশ সুদ দিতে হবে।

এই সমস্ত দাবিগুলি ছাড়াও নেতৃবৃন্দ শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার হরণ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিল করার এবং এই রায়ের ফলে শাস্তিপ্রাপ্তদের শাস্তি প্রত্যাহারের দাবি জানান। ঠিকা শ্রমিকদের স্বার্থে পূর্বেকার রায়কে নতুন রায়ের দ্বারা বাতিল না করার দাবি জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্ট বেসরকারি স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের 'শ্রমজীবী' হিসাবে আখ্যা দেয়নি। ফলে গ্র্যাচুইটি সহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। নেতৃবৃন্দ জনবিরোধী এই রায় বাতিলেরও দাবি জানান।

একই সাথে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে আই এল ও কোর কনভেনশনের ৮৭নং ধারা অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিতভাবে দরকষাকষির অধিকার এবং ১৫১ ও ১৫৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত অধিকারগুলির অনুমোদনের দাবি জানান। ১ মে-কে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করারও দাবি জানান।

এছাড়া গণবণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন-রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ পুনর্বিবেচনা, পার্লামেন্টে উত্থাপিত ব্যাঙ্ক ও কয়লাখনি বেসরকারীকরণ বিল বাতিল, চা-পাট-নারকেল ছোবড়া-তাঁত-হ্যান্ডলুম-খাদি এবং বিভিন্ন গ্রামীণ শিল্প এবং বিড়ি-চিনি প্রভৃতি শিল্পের সঙ্কট এবং মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হয়।

অবিলম্বে বিনা শর্তে বন্ধ চা-বাগান খুলতে হবে

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী

চা-বাগানের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ও অনাহারে মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা ২১ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

"বেশ কয়েকটি চা-বাগান বন্ধের কারণে শ্রমিকদের কাজ না থাকা ও খাবার, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদির অভাবে এলাকায় শ্রমিক পরিবারে বিপর্যস্ত অবস্থা ও অসহনীয় দারিদ্র্যের কারণে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বার বার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের কাছে জানিয়ে প্রতিকার চেয়েছি। কিন্তু রাজ্য সরকার কিছু বৈঠক করা ছাড়া কার্যকরী কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়েছে, যা বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টে ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। কয়েকমাস আগেই মৃত্যুর সংখ্যা ১,৫০০ ছাড়িয়েছে। আমাদের আশঙ্কা, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। আমরা মনে করি, এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমরা পুনরায় দাবি করছি —

১। অবিলম্বে বিনাশর্তে সমস্ত বন্ধ চা-বাগান খুলতে হবে,
২। মালিকরা বাগান না খুললে তাদের বাগানের লিজ বাতিল করে রাজ্য সরকারকে বাগানগুলি অধিগ্রহণ করে চালু করতে হবে,
৩। ক) দেশীয় চা-শিল্প রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অবাধ আমদানি নীতি বন্ধ করতে হবে,
খ) সমগ্র চা-ব্যবসা (কেনা-বেচা) রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে হবে,
৪। বন্ধ বাগান সহ সমস্ত বাগানে, রেশন, বিদ্যুৎ, জল, চিকিৎসা পরিষেবা ও রিলিফের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে,
৫। প্রতিটি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনায় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় চা-শ্রমিকদেরও ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।"

প্রস্তাবিত সালিশি বোর্ড প্রসঙ্গে

দুয়ের পাতার পর

আরও লক্ষণীয়, আদালতী বিচারব্যবস্থা "শত্রুতা সৃষ্টি করে", একথা বলার দ্বারা এবং আদালতের বিচার "সমঝোতার পরিবেশ দূরীভূত করে" এই আপাতমধুর বচনের আড়ালে তারা কম্পাউন্ডেড অফেন্সের অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু শাস্তিযোগ্য অপরাধকেও বাধ্যতামূলক সমঝোতার আওতায় টেনে আনতে চাইছে। এ প্রসঙ্গে আইনজীবীরা সুনির্দিষ্টভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় "শ্লীলতাহানির অভিযোগের" দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করেছেন। এই ধারায় অপরাধ যে ক্রমাগত বাড়ছে তাই নয়, ঠিকাদার, ইটভাটা মালিক থেকে শুরু করে যারাই গরিব নারী-মজুরদের কাজে লাগায় তাদের একটা বড় অংশ এবং সমাজবিরোধীরা শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকে ক্রমাগত এ ধরনের অপরাধ করে চলেছে। সব থেকে আতঙ্কের কথা, ইদানীং সংবাদপত্রের পাতাতেও যে কথা বেরিয়ে আসছে তা হচ্ছে, বেশিরভাগ খুন-ডাকাতি ও নারীর শ্লীলতাহানির মত জঘন্য নারকীয় ঘটনার পিছনে শাসকদলের নেতা ও মাতব্বররা নিজেরাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। এমতাবস্থায় এই ধরনের অপরাধকে প্রস্তাবিত সালিশি বোর্ডের মাধ্যমে আপস মীমাংসার আওতায় টেনে আনলে ভয় দেখিয়ে বা টাকা দিয়ে লাঞ্ছিতের ও সাক্ষীদের মুখ বন্ধ করার পথই প্রশস্ত করা হবে, এ সম্ভাবনা কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এও লক্ষণীয়, বোর্ডের সালিশদের নিযুক্তির প্যানেল তৈরির বকলমে পঞ্চায়েত সমিতিই তাদের নিযুক্ত করবে। নামে প্রশাসনিক কর্তারা সালিশ বোর্ডের নিয়োগের অধিকারী হলেও, যেহেতু প্যানেলের মধ্য থেকেই তাদের নিয়োগ করতে হবে, তাই পঞ্চায়েত সমিতির ইচ্ছা এবং নাম নির্বাচনই এখানে কার্যত শেষ কথা বলবে। নিয়োগের মেয়াদ মাত্র দু'বছর হওয়ায় এবং নিযুক্ত পদে বহাল থাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় প্রাথমিক নাম বাছাই এবং পরে পুনর্নিয়োগ দু'টির জন্যই সালিশ ও পরামর্শদাতারা পঞ্চায়েত সমিতির স্নেহভাজন অপরাধীর প্রতি নরম মনোভাব নিয়ে চলতে বাধ্য হবেন। ফলে বাস্তবে শাসকদল ও ক্ষমতাশালীদের আজ্ঞাবাহী একটা অনুগত বিচারব্যবস্থা ব্লক স্তর পর্যন্ত গড়ে উঠবে, যেখানে শাসকদলের নগ্ন দলীয় স্বার্থ রক্ষাই হবে মূল উদ্দেশ্য, গরিবের নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফলে মাথা কুটে মরবে।

গণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ইতিমধ্যে বহুলাংশে ধ্বংস হলেও, আজও তার রেশ যতটুকু টিকে আছে তাকেও নিঃশেষে মুছে ফেলে সবটাই শাসকদল ও আজ্ঞাবাহী প্রশাসনের কুক্ষিগত করাই এই বিলের লক্ষ্য। গ্রাম বাংলার বাস্তব অবস্থার সাথে পরিচিত মানুষ মাত্রই জানেন, সিপিএম দলীয় কব্জা শক্ত করার জন্য কীভাবে গ্রামীণ বিবাদকে ব্যবহার করে থাকে। এজন্য তারা গ্রামীণ বিবাদ উস্কে দিতেও দ্বিধা করে না এবং যেকোন সাধারণ বিবাদেও নাক গলিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়ে একপক্ষকে দলে টেনে এনে জনগণের ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করে, দলীয় রং চড়িয়ে তাকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। বর্তমানে সালিশি বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে গ্রাম্য বিবাদের সুযোগ নিয়ে বা সুবিধামতো এগুলি উস্কে তুলে আইনের জোরে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে গ্রামীণ জীবনে সিপিএমের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করা। এই দিকে নজর রেখেই লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলি বলেছেন — "এই বিলের লক্ষ্য গরিব মানুষের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়া নয়, এর লক্ষ্য হল বিচারকে প্রশাসন ও শাসকদলের কুক্ষিগত করা।" নিচুতলা পর্যন্ত শাসকদলের স্বৈরাচারকে নিষ্কণ্টক করা এবং শাসকদলের ছত্রছায়ায় আশ্রিত বিত্তশালীদের যথেচ্ছাচারকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়াই হল এই বিলের লক্ষ্য।

এই বিলের মধ্যে শাসকবর্গের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থাকার জন্যই আইনমন্ত্রী তাঁদের কাজের সমর্থন খুঁজেছেন মধ্যযুগের স্বৈরাচারী শাসন ও বিচারব্যবস্থার মধ্যে। দেশের ইতিহাস ও মার্ক্সবাদের ন্যূনতম ধারণা বিসর্জন দিয়ে তিনি মধ্যযুগের গ্রামীণ সালিশের নির্লজ্জ প্রশংসা করেছেন নির্দ্বিধায়। আইনমন্ত্রী লিখেছেন — "মোগল আমলে গ্রামবাংলার বিরোধ কদাচিৎ সরকারের গোচরে আসতো...উচ্চ মূল্যবোধ-সম্পন্ন গ্রামীণ পঞ্চায়েত গ্রাম শাসন করতো।" (গণশক্তি ২৩-৬-০৪) মধ্যযুগের মোহন্ত-মৌলবী এবং ভূস্বামী-সমাজপতি শাসিত, জাতিধর্ম বর্ণভেদবুদ্ধিতে জর্জরিত; নিম্নবর্ণ, গরিব এবং নারীদের প্রতি করুণাহীন গ্রামীণ সমাজে যারা গ্রাম শাসন করত তাদের মূল্যবোধ উচ্চ ছিল, এ-কথা কেবল উৎপীড়ক ও স্বৈরাচারের সমর্থকরাই বলতে পারে। তা নাহলে মানুষ সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নততর গণতান্ত্রিক আধুনিক আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করলো কেন?

গ্রামবাংলায় তাঁরা নিষ্কণ্টক দলতন্ত্র চালু করার জমি আরও পাকা করার উদ্দেশ্যেই যে এই বিল আনতে চলেছেন তা ঢাকা দিতে আইন মন্ত্রী বলেছেন — "সালিশি আদালতের বিকল্প নয়, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যম মাত্র।" অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আদালতের বিকল্প কিছু করে আদালতকে তাঁরা গৌণ করছেন না, শুধু সুবিধার জন্য বিরোধ নিষ্পত্তির একটা বিকল্প মাধ্যম তৈরি করছেন। তাই যদি হবে, তবে তাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার যে কথা তিনি নিজেই বলেছেন তার কোন অর্থ থাকে কি? তাছাড়া তা যদি আদালতের বিকল্প না হয় এবং শেষপর্যন্ত আইনের বিচার পেতে আদালতেই যেতে হয়, তবে তা গরিবের কাছে দ্রুত স্বল্পমূল্যে বিচার পৌঁছে দেবে কী করে? বা, আদালতে জমা মামলার পাহাড় খালাস করবে কী করে? আসলে ভাষার মারপ্যাঁচ যাই করুন, আইনি স্বীকৃতির দ্বারা সালিশি বোর্ডকে কার্যত আদালতের বিকল্প হিসাবেই তাঁরা খাড়া করছেন।

প্রকৃতপক্ষে আপস মীমাংসার নামে ধনীর পক্ষে দাঁড়িয়ে গরিবের ন্যায়বিচারের দাবিকে আদালতের বাইরেই গলাটিপে মারা এবং ধনীর পক্ষ নিয়ে গরিব ও বিরোধীপক্ষকে বিচারের নামে বিপদে ফেলে দলের কব্জা নিরঙ্কুশ করা ও অপরাধের সঙ্গে জড়িত দলীয় নেতা ও কর্মীদের বাঁচানোই এই সালিশি বোর্ড বিলের প্রধান লক্ষ্য। প্রচলিত বিচারব্যবস্থার প্রহসনের মধ্যেও যতটুকু নিরপেক্ষতা আজও আছে তাকে রক্ষা করতে হলে সমস্ত মানুষকেই এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

হিসাবের কারচুপি করে আবার বাসভাড়া বাড়াতে চলেছে সরকার

এ রাজ্যের বাসমালিকদের সংগঠনগুলি বাসভাড়া বাড়ানোর দাবি তুলে হৈ চৈ শুরু করেছে। বাস মালিকদের বক্তব্য, গতবারের ভাড়াবৃদ্ধির পর ইতিমধ্যে ৩.১৩ টাকা ডিজেলের দাম বেড়েছে। ফলে বাসভাড়া না বাড়ালে ১ জুলাই থেকে রাজ্য জুড়ে বাস ধর্মঘটের ডাক দেবে তারা। পরিবহনমন্ত্রী যথারীতি বাস মালিকদের পূর্ণ সমর্থন করে ভাড়াবৃদ্ধির পক্ষেই সায় দিয়েছেন। জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে তিনি বলেছেন, বাস তো জলে চলে না, তেলের দাম বাড়লে ভাড়া তো বাড়াতেই হবে। বাস যে জলে চলে না, একথা সবাই জানে। কিন্তু বাস মালিকরা ও পরিবহনমন্ত্রী যে হিসাব দিচ্ছেন, তাতে ৯০ শতাংশ জল আছে। সত্যমিথ্যায় জড়িয়ে হিসাবের কারচুপি করে দেখানো হচ্ছে ইতিমধ্যে ডিজেলের দাম বেড়েছে ৩.১৩ টাকা, যদিও বাস্তবে ডিজেলের দাম বেড়েছে ১.৫২ টাকা। ২০০২ সাল থেকে ডিজেলের দামবৃদ্ধির যে হিসাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তার তালিকা দেখে নেওয়া যাক।

ডিজেলের দামবৃদ্ধির সারণি

দামবৃদ্ধির তারিখ	ডিজেলের দাম
১৬. ৬. ২০০২	১৮.৬১ টাকা
৩১. ১১. ২০০২	১৯.৪৩ টাকা
২. ১. ২০০৩	২০.৪৫ টাকা
১৫. ১. ২০০৩	২০.৮৬ টাকা
১৫. ৩. ২০০৩	২৩.৫১ টাকা
[১.৪.০৩ ভাড়া বাড়ানো হয় যখন তেলের দাম ২৩.৫১ টাকা। প্রথম ৪ কিমি ভাড়া হয় - ৩.০০ টাকা]	
১৫. ৪. ২০০৩	২২.৫২ টাকা
২৬. ৪. ২০০৩	২১.৫১ টাকা
১৫. ৫. ২০০৩	২০.৫৭ টাকা
৩০. ৫. ২০০৩	২০.৪৭ টাকা
[৭.৬.০৩ ভাড়া কমানো হয় যখন তেলের দাম ২০.৪৭ টাকা। প্রথম ২ কিমি ভাড়া - ২.৫০ টাকা করা হয়।]	
১৫. ৭. ২০০৩	২১.৩৯ টাকা
১. ৯. ২০০৩	২২.৫৩ টাকা
[১০.১০.০৩ আবার ভাড়া বাড়িয়ে ১.৪.০৩ এর বর্ধিত ভাড়া চালু হয় যখন তেলের দাম ২২.৫৩ টাকা।]	
১৬. ১০. ২০০৩	২১.৯০ টাকা
১৬. ১২. ২০০৩	২২.৯৪ টাকা
১. ১. ২০০৪	২৩.৯৯ টাকা
১৫. ৬. ২০০৪	২৫.০৩ টাকা

এই সারণি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় ১.৪.০৩ তারিখে যখন ভাড়া বাড়ানো হয় তখন ডিজেলের দাম ২৩.৫১ টাকা হয়েছিল। তারপর তেলের দাম কমতে কমতে ২০.৪৭ টাকায় নেমে গেলে এস ইউ সি আই'র প্রবল আন্দোলনের চাপে ভাড়া কমাতে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার। যেখানে স্টেজে ৫০ পয়সা হারে ভাড়া বাড়িয়ে ছিল, সেখানে কমায় স্টেজে মাত্র ২৫ পয়সা। এরপর তেলের দাম বেড়ে ২২.৫৩ টাকা হলে রাজ্য সরকার ১.৪.০৩-এর বর্ধিত ভাড়া পুনরায় চালু করে। এক্ষেত্রে তেলের দাম এপ্রিল মাসের তুলনায় (২৩.৫১ টাকা - ২২.৫৩ টাকা) ৯৮ পয়সা কম থাকা সত্ত্বেও এপ্রিল মাসের হারে একই বর্ধিত ভাড়া চালু করে মালিকদের বাড়তি মুনাফা পাইয়ে দেওয়া হয়। এপ্রিলে যখন ভাড়া বাড়ানো হয় (১.৪.০৩) তখন তেলের দাম ছিল ২৩.৫১ টাকা। এখন যেখানে ভাড়া বাড়াতে চলেছে রাজ্য সরকার, তখন তেলের দাম ২৫.০৩ টাকা। অর্থাৎ, গতবারের ভাড়া বৃদ্ধির পর তেলের দাম বেড়েছে (২৫.০৩-২৩.৫১) ১.৫২ টাকা মাত্র।

বাসমালিকরা দাবি করছে, প্রথম স্টেজে ভাড়া ৪.০০ টাকা করতে হবে, পরবর্তী স্টেজগুলিতেও ১.০০ টাকা হারে বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে মালিকদের যুক্তি, বাসের উপর অনেক বেশি ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে। তার উপর ট্রাফিক পুলিশ ঘন ঘন জরিমানা করছে, জরিমানার টাকাও আগের থেকে অনেক বেশি। মালিকরা বলছে বাসে ১.০০ টাকা আয় ধরলে খরচ হয় ২.৫০ টাকা, অর্থাৎ ১.৫০ টাকা ঘাটতি। এই ঘাটতি বহন করে বাসমালিকরা বাস পরিবহন চালু রাখতে পারবে না। ৩০ জুনের মধ্যে ভাড়া না বাড়ালে ১ জুলাই থেকে তারা বাস ধর্মঘট করবে। অথচ একথা সকলেই বোঝেন যে, কোনও ব্যবসায়ীই দিনের পর দিন লোকসান করে ব্যবসা চালায় না। ফলে, বাস মালিকদের লোকসান হচ্ছে, একথা ঠিক নয়। বড়জোর তাদের লাভের অঙ্ক কিছুটা কমতে পারে।

প্রশ্ন হল, ১.৫২ টাকা মাত্র ডিজেলের দামবৃদ্ধির ফলে ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজন কতটুকু। গত ১.৪.০৩ বাসভাড়া বাড়ানোর সময় পরিবহনমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ১৫ শতাংশ ভাড়া বাড়ানো হল, এর মধ্যে তেলের দামবৃদ্ধির জন্য ৬ শতাংশ এবং বাসের চেহারা, সিট ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিবর্তন করে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য বাকি ৯ শতাংশ ব্যয় করা হবে। এক বছর পার হয়ে গেছে বাসের চেহারার কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি? বরং অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। যাত্রীদের পকেট কেটে এই ৯ শতাংশ ভাড়া উপরিলাভ হিসাবে বাসমালিকদের পকেটে গেছে। এই যে উপরিলাভ মালিকরা পাচ্ছে, ১.৫২ টাকা লিটার প্রতি ডিজেলের বাড়তি দামের জন্য ঐ ৯ শতাংশের ৪-৫ শতাংশ খরচ হতে পারে বড়জোর। বাকি ৪ শতাংশ তো এরপরও উপরিলাভ মালিকরা পাবে। তাছাড়া প্রতিবার ভাড়া বাড়ানোর সময় তেলের দামের তুলনায় ভাড়ার হার বেশি রাখা হয়, যাতে ভবিষ্যতে দু-তিন বার তেলের দাম বাড়লেও বাসভাড়া বাড়াতে না হয়, একথা পরিবহনমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন। ফলে ভাড়াবৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই।

একথা ঠিক গাড়ির উপর ট্যাক্স আগের থেকে বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু এই ট্যাক্সের বোঝা কেন যাত্রীরা বহন করবে? এর জন্য বাসমালিকরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে যাত্রীদের সমর্থন পাবেন, অতীতেও পেয়েছেন। প্রয়োজনে এই দাবিতে লাগাতার বাসধর্মঘটের ডাক দিকমালিকরা। রাজ্য সরকারকে বাধ্য করুন বর্ধিত পরিবহন কর প্রত্যাহার করতে। ডিজেলের দাম বাড়লেই মালিকরা কেন ভাড়াবৃদ্ধির দাবির সাথে ট্যাক্সের কথা তোলেন? অন্যসময় তাঁরা নীরব থাকেন কেন? ট্রাফিক পুলিশের অত্যাচার এবং জরিমানা আদায়ের জন্য মালিকদের যে খরচ তাও ভাড়া বাড়িয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে তুলে নেওয়ার আব্দার করছেন তাঁরা। যেমন অতীতে তাঁরা বলেছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় ঘুষ দেওয়ার জন্য যে খরচ হয় তাও যাত্রীদের ভাড়ায় যুক্ত করতে হবে।

সরকার একটি সংগঠিত শক্তি। বাসমালিকরাও সংগঠিত, কিন্তু রাজ্যের লক্ষ লক্ষ যাত্রী সাধারণ অসংগঠিত। এর ফলেই সরকার ও বাসমালিকরা যাত্রী সাধারণের উপর যথেচ্ছ আক্রমণ চালাচ্ছে। আমাদের দলের পক্ষ থেকে বার বার দাবি করা হয়েছে, ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিলে সর্বদলীয় প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, বাসমালিক সংগঠন, বাসকর্মী সংগঠন, যাত্রী কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে তদন্ত কমিটি করে পরিবহনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে ভাড়াবৃদ্ধির দরকার হলে কতটা ভাড়া বাড়ানো প্রয়োজন তা ঠিক করা হোক। দুঃখের বিষয় ২৭ বছরের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার কোন গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি মেনে বাসভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অতীতে কখনো নেয়নি, এবারেও নেবে না। একমাত্র জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধই এ অন্যায় রুখতে পারে।

সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অপদার্থতার প্রতিবাদে ২৪ জুন কলকাতায় এ আই ডি এস ও'র বিক্ষোভ

খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে
বাঁকুড়ায় মহিলাদের পথ অবরোধ

বাঁকুড়ার কেঞ্জেকুড়ার এক যুবতী শুভ্রা বিশ্বাস একমাস আগে নিখোঁজ হয়ে যান। পুলিশকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। সম্প্রতি তালডাংরার জঙ্গলে শুভ্রার মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং বোঝা যায় যে, অত্যাচার করে তাকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ শিউরে উঠেছেন, খুনিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন উদাসীন, বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও খুনিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অপর একটি ঘটনায় ছাতনা স্টেশনে জিআরপি থানা থেকে উম্মে হাবিবা নামে এক ১৪ বছরের কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যায়। রেল পুলিশ বলছে, সে কোথায়, তারা জানে না। মেয়েদের নিখোঁজ ও হত্যার এরূপ আরও কয়েকটি ঘটনা জেলায় ঘটেছে। এরই প্রতিবাদে ও নাগরিক নিরাপত্তায় পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার দাবিতে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ও স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় মহিলারা ২৩ জুন শহরের মাচানতলায় পথ অবরোধ করেন। এই দাবিতে জেলা শাসকের দপ্তরেও মহিলারা অভিযান করবেন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ঝাড়গ্রামের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ জুন এক বিবৃতিতে বলেন —

"মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আইন-শৃঙ্খলার 'মরূদ্যান' পশ্চিমবঙ্গে অনাহারে মৃত্যু, খুন-ডাকাতি-ছিনতাই, গণধর্ষণ, নারীর শ্লীলতাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের ঘটনায় তা আর একবার প্রমাণিত হল। গত ২৬ জুন ঝাড়গ্রামের গড়শালবনিতে স্ত্রীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করতে গেলে স্বামী সুনীল মাহাতোকে দুষ্কৃতীরা চলন্ত বাস থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। সেই সঙ্গে দাবি করছি —

১। মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে,

২। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।"

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net